সর্বনেশে ভুল অঙ্ক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বনেশে ভুল অঙ্ক
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সর্বনেশে ভুল অঙ্ক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ: আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী, ১৪২০

গুপ্তিপাড়ার কাছে এমন গো-হারান হারতে হবে, এটা নবু স্বপ্নেও ভাবেনি। গুপ্তিপাড়ার খেলুড়েরা মারকুট্টা বটে, গায়েগতরেও তারা ভাল। কিন্তু ফুটবলের কূটকৌশলে তারা একেবারেই আনাড়ি। গতবারেও গদাধর লিগে তাদের গুনে-গুনে তিন গোল দিয়েছিল বিদ্যাধরপুর। আর বলতে কী, এ বছর বিদ্যাধরপুরের টিম খুবই চনমনে। লিগের চারটি খেলার সব কটাতেই তিন-চার গোলে জিতেছে। আজ যে এমন ল্যাজেগোবরে হতে হবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল। গুপ্তিপাড়া আজ ল্যাং মারামারি করে খেলেনি। সত্যি কথা বললে বলতে হয়, গুপ্তিপাড়া আজ বেশ ঠান্ডা মাথার ফুটবলই খেলেছে। তবু এঁটে উঠতে পারত না, যদি না পাঁচু নামে একটা নতুন প্লেয়ার আজ ওরকম সাঙ্ঘাতিক খেলত। যেমন পায়ের কাজ, তেমনই হরিণের মতো দৌড়, তেমনই মারাত্মক শটের জোর আর হেডের কেরামতি। ওই একটা ছেলেই আজ বিদ্যাধরপুরকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিল।

দেবেন ঘোষ একজন পাকা ফুটবল কোচ বিদ্যাধরপুর টিমকে তিনিই গত তিন বছর তালিম দিয়ে এমন দুর্ধর্ষ করে তুলেছেন। গত তিন বছরই বিদ্যাধরপুর গদাধর লিগে চ্যাম্পিয়ন। তার মধ্যে গতবার তে তারা একটা ম্যাচেও হারেনি। সেই দেবেন ঘোষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, ওই পাচু ছোকরার মতো খেলোয়াড় তিনি খুব কমই দেখেছেন।

অস্বীকার করে লাভ নেই, নবুর একটু গুমোর ছিল। সে গতবার বেস্ট প্লেয়ারের প্রাইজ পেয়েছে। এ বছরও লিগের শুরু থেকেই সে ভাল খেলছে এবং লোকে ধরেই নিয়েছে যে, এবারও সে বেস্ট প্লেয়ার হবে। কিন্তু আজ বুঝে গেল, আশা নেই।

বলতে গেলে বিদ্যাধরপুর আর গুপ্তিপাড়া পাশাপাশি গ্রাম। মাঝখানে শুধু একটা ঝিল আর একটা জঙ্গল। একটা কাক যদি গুপ্তিপাড়া থেকে উড়তে-উড়তে বিদ্যাধরপুরের দিকে যায়, তা হলে ঘড়ি ধরে তার পৌঁছতে দু মিনিট লাগবে। আর কাকের মুখেই গুপ্তিপাড়ার খবর বিদ্যাধরপুরে ছড়ায় আর বিদ্যাধরপুরের খবর গুপ্তিপাড়ায়। দুই গাঁয়ে আকচা-আকচিও লেগেই আছে। শুরুটা হয়েছিল বছর পঞ্চাশেক আগে যখন গুপ্তিপাড়ার জমিদার মহিম ঘোষাল রবীন্দ্রজয়ন্তীতে এক কাবুলিওয়ালাকে ধরে এনে তাকে দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এর জবাবে কী করা যায়, তা নিয়ে বিদ্যাধরপুরে জরুরি মিটিং বসে গেল। শোনা যায়, অবশেষে হরিসভার আসরে একজন চিনেম্যানকে দিয়ে কীর্তন গাওয়ানো হয়েছিল। সোজা কথা, দুই গাঁয়ের সম্পর্ক হল, এ জিভ ভ্যাঙচালে ও বক দেখায়। সেবার বিদ্যাধরপুরের মেয়ে রুক্মিণী হালদার মাধ্যমিকে পঞ্চম হয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। গুপ্তিপাড়ায় তখন হাহাকার। কিন্তু হার মানলে তো চলবে না। বগলাপতি মেমোরিয়াল স্কুলের ক্লাস টেন-এর ফাস্ট বয় দুলাল কুণ্ডুর উপর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল, “তোকে স্যান্ড করতেই হবে।”

দুলালের জন্য নানা জায়গা থেকে বাঘা-বাঘা শিক্ষকদের টেনে আনা হল স্পেশাল কোচিংয়ের জন্য। দিনরাত পড়ার চাপে দুলাল চিঁ চিঁ করতে লাগল। তবে গ্রামের মুখরক্ষা করতে রক্ত আমাশা নিয়েও পরীক্ষা দিয়ে সে মাধ্যমিকে শেষ অবধি থার্ড হয়ে গ্রামের মান বাঁচিয়েছিল। তাই গদাধর লিগে গত তিন বছর ধারাবাহিক হেরে আসাটা যে গুপ্তিপাড়া সহ্য করবে না, এটা জানাই ছিল।

বলা বাহুল্য, দুই গায়ের বেশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আড়কাঠি আছে। এ গাঁয়ের আড়কাঠি ও গাঁয়ের গুপ্ত খবর সংগ্রহ করে আনে, তো ও গায়ের আড়কাঠি এ গায়ের তত্ত্বতলাশ নিয়ে যায়।

দু'গাঁয়েই দু'জন পিশাচসিদ্ধ তন্ত্রসাধক আছেন। বিদ্যাধরপুরে দুলালখাপা আর গুপ্তিপাড়ায় সনাতন সিদ্ধাই দু'জনের কেউ কারও মুখদর্শন করেন না। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অঘোষিত যুদ্ধ আছে। দু'জনের মধ্যে কে বেশি শক্তিমান তান্ত্রিক, তা এখনও সাব্যস্ত হয়নি। কখনও এর দর ওঠে তো কখনও ওর দর। এই যে গত তিন বছর ধরে বিদ্যাধরপুর গদাধর লিগ জিতে আসছে, তার পিছনে নাকি দুলালখ্যাপার হাত আছে। তিনি যোগবলে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পদবন্ধন করে দেন বলেই বিদ্যাধরপুর হেলায় তাদের হারায়। কথাটা উঠতেই গুপ্তিপাড়ার সনাতন সিদ্ধাইয়ের ভক্তরা বলে, "আমাদের বাবাঠাকুর পায়ের মতো হীন অঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামান না। তার অনেক বড়-বড় কাজ আছে। এলেবেলে তান্ত্রিকদেরই নিচু নজর।"

মড়া পোড়ানোর সময় শ্মশানবন্ধুরা যেমন গোমড়া মুখ করে বসে থাকে, তেমনি ভাবেই বিদ্যাধরপুরের মহেন্দ্রপ্রতাপ স্মৃতি পাঠাগারের রিডিংরুমে কয়েকজন বসে আছেন। কারও মুখেই কথা নেই। শুধু মাঝে-মাঝে কাঁদুনে করালী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গলা কাঁপিয়ে শাজাহানের মতো আর্তনাদ করে উঠছেন,"এ কী হল রে!"

করালীবাবুর এই আর্তনাদ অবশ্য নতুন কিছু নয়। যৌবনে তিনি 'শাজাহান'-এ শাজাহান, সিরাজ-উদ-দৌলা'য় সিরাজ-উদ-দৌলা, টিপু সুলতান'-এ টিপু সুলতান এবং কেদার রাজা'য় কেদার রাজার পার্ট বিস্তর করেছেন।

এখনও তাঁর হাঁটাচলা, কথার্বাতা, ভাবভঙ্গিতে সর্বদাই কখনও শাজাহান, কখনও টিপু, কখনও কেদার, কখনও সিরাজ এসে পড়ে। আসল করালী কেমন, তা লোকে ভুলেই গিয়েছে। এর জন্য কাঁদুনে করালীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মহড়া দিয়ে-দিয়েই তার এই অবস্থা।গুপ্তিপাড়ার নয়ন মল্লিক, না বিদ্যাধরপুরের কাঁদুনে করালী, কে বড় অভিনেতা, তার মীমাংসা আজও হয়নি।

রাঘববাবুর চেহারা যেমন, মেজাজও তেমন। ফরসা টকটকে রং, চওড়া কাঁধ, মুগুরের মতো দু'খানা হাত। বাঘের মতো জ্বলজ্বলে চোখ। পড়তি জমিদারবংশের ছোট তরফ। সকলে তাকে সামলে চলে। ঘরে নিস্তব্ধতা ভেঙে তিনিই প্রথম গর্জনটা করলেন, "কী ভেবেছে কী ওরা? বেআইনি ভাবে বাইরের

প্লেয়ার খেলিয়ে পার পেয়ে যাবে? দেশে আইন নেই? সংবিধান নেই? আমরা অবজেকশন দিয়ে কমিটিতে চিঠি লিখব।”

ইনফর্মার বা আড়কাঠি উমেশ ন্যাড় দরজার পরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কথা কইতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না বলে খুক করে একটু কেশে নিজেকে জানান দিল মাত্র। পাম্পসেটের মিস্ত্রি হওয়ার সুবাদে তাকে পাঁচটা জায়গায় যেতে হয়। তার উপর গুপ্তিপাড়া তার শ্বশুরবাড়িও বটে। রাঘববাবু তার দিকে চেয়ে ফের গর্জন করলেন, “তোর কাছে কী খবর আছে?”

উমেশ ন্যাড় মাথা চুলকে বলে, “খবরটা খুব গোলমেলে।”

“কী রকম?”

“আজ্ঞে, পাঁচু ছোড়ার ভোটার কার্ড আছে। কিন্তু সে রাশিয়ান ভাষায় কথা কয়।”

“রাশিয়ান!” ভ্র কুঁচকে রাঘববাবু বললেন, “তুই বুঝলি কী করে? তুই কি রুশ ভাষা জানিস?”

মাথা নেড়ে উমেশ বলে, “আজ্ঞে না।”

“তা হলে?”

“আজ্ঞে ওই রকমই যেন মনে হল।”

আর একজন আড়কাঠি গন্ধেশ্বর বণিক এতক্ষণ ঘরের এক কোণে একটা টুলের উপর বসে ছিল। ঘরের শোকার্ত আবহাওয়ায় কথা কওয়ার ফুরসত হয়নি। সেও গলাখাকারি দিয়ে নিজেকে একটু জানান দিল। তারপর আমতা-আমতা করে বলল, “আজ্ঞে বিদ্যাধরপুরে বিশ্বেশ্বর হাওলাদারের পাশেই আমার মাসির বাড়ি। সেখানেই শুনেছি, পাঁচু নাকি পাঁচ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়য়, দশ ফুট হাইজাম্প দিতে পারে, মোটা নাইলনের দড়ি দু হাতে টেনে ছিড়ে ফেলতে পারে!”

মৃদুভাষী মৃদুলবাবু গলা তুলে বলে ফেললেন, “ওরে, থাম-থাম, গাঁজা টেনে এসেছিস নাকি? পাঁচ সেকেন্ডে একশো মিটার কি ছেলের হাতের মোয়া? উসেন বোল্টের বিশ্বরেকর্ড কত জানিস?”

মাথা নেড়ে গন্ধেশ্বর বলল, “আজ্ঞে না, আমাদের জ্ঞানগম্যি আর কত দূর! যা শুনি তাই বলি আজ্ঞে। বিশ্বেশ্বর হাওলাদার বলে বেড়াচ্ছে পাঁচু নাকি তার ভাইপো। এতদিন ফুলবেড়িয়ায় ছিল। এখন থেকে পাকাপাকি গুপ্তিপাড়াতেই থাকবে।” সুফল নন্দী ভ্রু কুঁচকে বললেন, “বিশ্বেশ্বর হাওলাদার তো সনাতন সিদ্ধাইয়ের নাতি। তাই না?”

“যে আজ্ঞে।”

কোচ দেবেন ঘোষ একাধারে মুখ চুন করে অপরাধীর মতো বসে আছেন। কোচের চাকরিটা এবার যায় কিনা কে জানে! রাঘববাবু তার দিকে বাঘা চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “পাঁচু ছোড়ার খেলা দেখে আপনার কী মনে হল? সে কত জোরে দৌড়য়?”

দেবেন ঘোষ খুব চিন্তান্বিত মুখে বললেন, “আজ্ঞে পাঁচ সেকেন্ডে একশো মিটার কোনও মানুষের পক্ষেই দৌড়নো সম্ভব নয়। তবে পাঁচুর দৌড় খুবই ভাল।”

“ড্রিবলিং?”

কী বললে রাঘববাবু রেগে যাবেন না, তা ভাবতে-ভাবতে উদ্বিগ্ন গলায় দেবেন ঘোষ বললেন, “আজ্ঞে, ড্রিবলিং মন্দ নয়।”

“ঝেড়ে কাশুন মশাই। ‘মন্দ নয়’ থেকে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের নবু কি খারাপ ড্রিবলিং করে?”

ফাঁপড়ে পড়ে দেবেন ঘোষ আমতা-আমতা করে বলেন, “এই নবুর মতোই। উনিশ-বিশ হতে পারে।”

“উনিশ-বিশ হলে ওই একটা ছেলে আপনাদের এমন ঘোল খাওয়াল কী করে? শুনেছি, সেকেন্ড হাফে কিছুক্ষণ খেলার পরই ওরা পাঁচুকে তুলে নেয়। অর্থাৎ পাঁচু মাঠে থাকলে আপনারা আরও কয়েকটা গোল খেতেন, তাই না?”

দেবেন ঘোষ আর্তনাদের গলায় বললেন, “না-না। আমরা ডিফেন্সকে রি-অরগানাইজ করে নিয়েছিলাম। গোল আর বাড়ত না।”

“ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।”

দেবেন ঘোষ সশ্রদ্ধভাবে চুপ করে রইলেন।

উমেশের দিকে চেয়ে রাঘববাবু গম্ভীর গলায় বললেন,“ওই ছোঁকড়াটা সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ নিয়ে পাকা খবর আনতে হবে। যদি প্রমাণ হয় যে, ও ভূমিপুত্র নয়, তা হলে ম্যাচটা বাতিল হয়ে যাবে। দু' পয়েন্ট আমাদেরই হবে।”

হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকল গদাই ঢাং। সে কাঠের মিস্ত্রি। গুপ্তিপাড়ায় তার দিব্যি যাতায়াত। বলল, “আমি কথাটথা কয়ে দেখেছি কিন্তু। পাঁচু নির্যশ কেরলের ছেলে।”

রাঘববাবু অবাক হয়ে বলেন, “কেরল! কথা কয়ে দেখলি?”

“যে আজ্ঞে। বিশ্বেশ্বর হাওলাদারের ইদানীং পয়সা হয়েছে খুব। সেগুন কাঠের একটা খাটের বরাত দিল। সেটা যখন বানাচ্ছিলুম, তখন ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল। খাটি তামিল ভাষা।”

“তুই আবার তামিল শিখলি কবে?”

“শিখিনি তো! সে তার মতো কথা কয়ে গেল, আমি আমার মতো।”

“তামিল কেরলের ভাষা নয়, তামিলনাড়ুর।”

“আমি যে ভাষাটা বুঝতে পারি না, সেটাকেই তামিল মনে হয়।”

রাঘববাবু বললেন, “ভাষা তো বুঝিসনি বুঝলাম, হাবেভাবে কিছু বুঝতে পারলি?”

“তেমন কিছু নয়। রোগা প্যাংলা চেহারার ছেলে। দেখে তো মনে হয় পেটের রোগে ভোগে।”

“রোগাভোগা হলে এত জোরে দৌড়য় কী করে, শটেরই বা অত জোর কোত্থেকে আসে?”

“আজ্ঞে, সেইটেই চিন্তার কথা। বিশ্বেশ্বরবাবুর শোওয়ার ঘরে একটা ভারী ছ্যাঁচা লোহার সিন্দুক আছে। খাটটা পাতবার সময় দেখা গেল, সিন্দুকটা অন্তত হাতদু'য়েক না সরালে খাট পাতা যাবে না। তা অত বড় আর ভারী সিন্দুক নড়াতে অন্তত পাঁচ-ছয়জন জোয়ান লোকের দরকার। আট-দশ মণ ওজনের নিরেট জিনিস। তা সেই কথা বিশ্ববাবুকে বলে ফিরে এসে দেখি, উফ সে ঘটনা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়ার নয়।”

“কী দেখলি বাবা?”

“দেখি, ছোকরা কোমরে দুটো হাত রেখে দাঁড়িয়ে কোনও কসরত না করে, গা না ঘামিয়ে স্রেফ ডান হাঁটুর আলতো ঠেলায় সিন্দুকটাকে হড়হড় করে তিন হাত সরিয়ে দিল।”

“দুর ব্যাটা! গুলগাপ্পার আর জায়গা পেলি না।”

“মা কালীর নামে কিরে কেটে বলছি কর্তা। চোখে না দেখলে পেত্যয় হয় না।”

“বেহ্মদত্যি নাকি রে?”

“তা জানি না কর্তা। যা চোখে দেখেছি, বললাম। পেত্যয় না হলে বিশ্বেশ্বর হাওলাদারের বাড়ির কাজের লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন গে।”

মৃদুভাষী মৃদুলবাবু এবার বললেন, “রাঘববাবু, গায়েগঞ্জে এরকম বহু কাল্পনিক গল্পের রটনা হয়। ও সবে গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল।”

মহেশ মহাপাত্র পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, “বোঝা গেল যে, ছোকরার কিছু এলেম আছে। তাই নিয়েই এই সব গালগল্প তৈরি হচ্ছে।”

যারা দুলালখ্যাপাকে ধরে আনতে গিয়েছিল, তারা তাকে নিয়ে এসে হাজির হল। দুলালখাপা লম্বাচওড়া মানুষ, কালো দাড়িগোঁফ, কালো বাবরি, পরনে রক্তাম্বর। একটু সঙ্কুচিত ভাব। একটা অস্পষ্ট স্বস্তিবাচন আউড়ে বসলেন।

রাঘব জিজ্ঞেস করলেন, “কী হে তান্ত্রিক, তোমার জারিজুরি কোথায়?”

“আজ্ঞে, আমাশা হওয়াতে প্রক্রিয়ায় কিছু বিঘ্ন ঘটেছে।”

“আমাশা! তোমার আমাশা কীসের? যোগবলে সারাতে পারলে না?”

“সাধারণ আমাশা তো নয়, এ যে প্রায়শ্চিত্ত।”

“কীসের প্রায়শ্চিত্ত হে?”

“ওই রথীনবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। উনিই দায়ী। রিষ্টি কাটানোর জন্য আমাকে গিয়ে ধরে পড়েছিলেন। তা আমি গণনা করে নিদান দিয়েছিলাম, মা কালীকে নিখুঁত কালো একটা পাঠা উচ্ছু করতে। তা উনি কালো একটা পাঠা নিয়েও এলেন। কিন্তু চান করাতে গিয়ে দেখা গেল সেটার গা থেকে রং উঠছে। শেষে কটাসে রং বেরিয়ে পড়ল। আমি রাজি ছিলাম না। কিন্তু রথীনবাবুর চাপাচাপিতে সেই কটাসে রঙের পাঠাই বলি দিতে হল। সেই থেকে আমাশা।”

ঠিক এই সময়ে কাঁদুনে করালী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গলা কাঁপিয়ে আর্তনাদ করলেন, “এ কী হল রে?”

২

গোলোকবাবু ছোট্ট, দুষ্টু একটা অঙ্কের পিছনে ছুটে-ছুটে হয়রান হচ্ছিলেন। কিছুতেই ধরতে পারছেন না। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে ইঁদুরের মতো ছুটছে অঙ্কটা। এক-একবার নাগালে আসছে বটে। কিন্তু যেই গোলোকবাবু খপ করে ধরতে হাত বাড়াচ্ছেন, অমনই ঠিক সুট্ করে সরে যাচ্ছে গোলোকবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে আর ঘামতে-ঘামতে মাঝে-মাঝে কাতরকণ্ঠে মিনতি করছিলেন, "ওরকম দুষ্টুমি করে না রে। এবার ধরা দিয়ে ফ্যাল বাবা! আর কত খাটাবি বাবা আমায়! তোর সঙ্গে কি আমার শত্রুতার সম্পর্ক রে! তোকে যে বড় ভালবাসি।" কিন্তু কে শোনে কার কথা। ছোট্ট মিষ্টি অঙ্কটা দেখা দিয়েই ফের গা ঢাকা দিচ্ছে। জঙ্গলের আলোয় ছায়ায় তাকে ঠাহর করাই মুশকিল। গোলোকবাবু ঠিক করলেন আর দৌড়ঝাঁপ না করে এক জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকবেন। তাতে অঙ্কটা ভাববে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। একটা ঝোপের আড়ালে সত্যিই ঘাপটি মেরে ওত পেতে রইলেন গোলোকবাবু এবং একটু পরেই টের পেলেন, ছোট্ট, মিষ্টি অঙ্কটা ঝোপের ওপাশে ইঁদুরছানার মতো তুড়তুড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরটা অঙ্ক দিয়ে তৈরি। চারটে পা যেন চারটে দুই, লেজটা যেন এক, চোখ দুখানা দুটো শূন্য, কান দু'খানা যেন দুটো পাঁচ। ভারী আহ্বাদের সঙ্গে সন্তর্পণে হাত বাড়ালেন গোলোকবাবু। লেজটা ধরেও ফেললেন। কিন্তু অঙ্কটা হঠাৎ কুটুস করে তার হাতে এমন কামড় দিল যে, গোলোকবাবু "উঃ," বলে চেঁচিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় একটু হতাশই হলেন তিনি। স্বপ্নই দেখছিলেন বটে, তবে বড় সুখের স্বপ্ন। অঙ্কের স্বপ্নের মতো স্বপ্নই হয় না। ইস, যদি ছোট্ট অঙ্কটাকে ধরতে পারতেন, তা হলে কী মজাই না হত।

গোলোকবিহারীর শয়নে, স্বপনে, জাগরণে শুধুই অঙ্ক। তার জগৎটাই অঙ্কময়। লোকে তার নাম দিয়েছে গুপ্তিপাড়ার রামানুজম। সব সময়ে অঙ্কের ঘোরে থাকেন বলে খিদে তেষ্টাও টের পান না। কিন্তু মাঝরাতে আজ ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় পাশের টুলে রাখা ঢাকা গ্লাসের জলটা ঢকঢক করে খেয়ে ফেললেন। এরকম স্বপ্ন অবশ্য তিনি প্রায়ই দেখে থাকেন। কখনও দেখেন, তিনি পুলিশ আর অঙ্ক হচ্ছে একজন ধূর্ত চোর। সেই চোর-অঙ্ককে পাকড়াও করার জন্য তিনি ছুটছেন, লাফাচ্ছেন, ঝাপাচ্ছেন। আর চোর-অঙ্কও তাকে নাকে দড়ি দিয়ে নাকাল করে ঘুরিয়ে মারছে। আবার কখনও দেখতে পান, তিনি এবং অঙ্ক যেন দুই কুস্তিগির। মল্লভূমিতে তাদের দু'জনের লড়াই হচ্ছে। কখনও তিনি অঙ্ককে পটকে দিয়ে চিত করে ফেলছেন, কখনও অঙ্কই তাকে ক্যাঁক করে ধরে পেড়ে ফেলে বুকে হাটু গেড়ে বসছে। এমনও দেখেছেন, একটা অঙ্ক যেন কাটা ঘুড়ির মতো আকাশে ভেসে-ভেসে যাচ্ছে। আর তিনি সেটা ধরার জন্য লগি হাতে পিছু-পিছু ছুটছেন। তবে সেদিন একটা স্বপ্ন দেখে ভয়ে তার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। দেখেন, রাতে বসে নিবিষ্টভাবে অঙ্ক কষছেন। হঠাৎ টের পেলেন, তখন যেন তিনি

আকাশে উঠে গিয়েছেন। তার টেবিল ভেসে আছে, চেয়ার ভেসে আছে, তিনি দিব্যি চাঁদের আলোয় অঙ্ক কষে যাচ্ছেন। হঠাৎ ভীষণ অবাক হয়ে দেখলেন, ঠিক তার উলটোদিকে আর একটা চেয়ারে একজন নীলচোখো সাহেব বসে তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। সাহেবের মাথায় বিশাল টাক, অল্পস্বল্প দাড়িগোঁফ আছে আর পরনে আলখাল্লার মতো একটা পোশাক।

গোলোকবাবু হকচকিয়ে যেতেই সাহেব একটা দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল। ভাষাটা গোলোকবাবু একেবারেই বুঝতে পারলেন না। তবে ইংরেজি যে নয়, তা হলফ করে বলতে পারেন। গোলোকবাবুর মনে হয়, লোকটা প্রশ্ন করছে, "তুমি খুব অঙ্ক ভালবাস বুঝি?"

গোলোকবাবু ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "হ্যাঁ সাহেব, আমি অঙ্ক বড্ড ভালবাসি।"

সাহেব তার বাংলা কথা বুঝতে পারল কিনা, তা গোলোকবিহারী জানেন না। কিন্তু সাহেব একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর তার দিকে আঙুল তুলে ফের কটরমটর করে কী সব যেন বলে গেল। যার এক বর্ণও গোলোকবাবুর মাথায় সেঁধল না। কিন্তু তার মনে হল, যেন সাহেব তাঁকে অঙ্ক কষার জন্য বকাঝকা করছে। যেন বলছে,"অঙ্কের তোমরা কী জান হে বাপুঃ অঙ্ক কি ছেলের হাতের মোয়া?"

ভয়ের চোটে গোলোকবিহারীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। সেই ঠান্ডায় গলা এমন বসে গেল যে স্বর বেরতে চায় না। চিঁচিঁ করে কোনওক্রমে বললেন, "আজ্ঞে, নাকে খত দিচ্ছি। আর অঙ্ক করব না। এবারটা মাপ করে দিন আজ্ঞে।"

সাহেব ভ্রু কুঁচকে তাঁর দিকে একটু চেয়ে হাত নেড়ে তাঁকে বিদায় দিল। আর তিনি ওই অত উচু থেকে ধাই করে নীচে পড়ে গেলেন। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে তিনি সেদিনও টের পেলেন যে, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা স্বপ্নই দেখছিলেন তিনি।

আসল কথা হল, ঘুমে বা জাগরণে গোলোকবাবুকে সর্বদাই ঘিরে থাকে নানারকম অঙ্ক। বিটকেল অঙ্ক, বিদঘুটে অঙ্ক, জটিল অঙ্ক, অসম্ভব অঙ্ক। ক্ষণজন্মা অঙ্কবিদ হিসেবে পাঁচটা গাঁয়ে তার নাম আছে। গুপ্তিপাড়ার যে স্কুলে তিনি পড়ান, সেখানেও তার খুব খাতির। ছাত্ররা তাকে সমীহ করে চলে। গাঁয়ের লোকও তাকে মান্যগণ্য করে। বাজারে গেলে মাছওয়ালা বা সবজিওয়ালা কেজিতে দু-পাঁচ টাকা দাম কমিয়ে দেয়। সভা-সমিতিতে তাঁকে প্রায়ই প্রধান বা বিশেষ অতিথি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা তার কাছে ভিজিট নেয় না। অঙ্কে গোলোকবাবুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো উপযুক্ত একজন অঙ্ক বিশারদকে বহুদিন ধরেই খুঁজছে বিদ্যাধরপুর। কিন্তু আজও তেমন বাঘা অঙ্কের পণ্ডিত পাওয়া যায়নি।

নেংটি ইঁদুরের মতো ছোট্ট, দুষ্টু অঙ্কটার কামড় খেয়ে ঘুম ভাঙার পর গোলোকবাবু আর ঘুমোলেন না। রাত সাড়ে তিনটে বাজে। এ হল ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

গোলোকবাবু জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে, শূন্যে, আকাশে-বাতাসে হাজার-হাজার অঙ্ক বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। ভোরবেলায় পরিষ্কার মাথায় খোলা জায়গায় পায়চারি করলে সেই সব অঙ্ক মাথায় ঢুকে পড়ে। বাইরে আজ একটু ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নাও আছে। তাই গোলোকবাবু শয্যাত্যাগ করে ছাদে উঠে এলেন। খোলা ছাদে হু-হু বাতাসে তার মনটা বড্ড ভাল হয়ে গেল। তিনি পদচারণা করতে করতে একটা আরামের শ্বাস ছেড়ে বললেন,"অঙ্কই হল অক্সিজেন!" ঠিক এই সময়ে ছাদের এক কোণে, যেখানে চিলেকোঠার ছায়া পড়েছে, সেখান থেকে কে যেন একটু মৃদু গলাখাকারি দিয়ে উঠল। গোলোকবাবু ভারী অবাক হলেন। এই অসময়ে বাড়ির ছাদের কারও তো থাকার কথা নয়! অন্য কোনও লোক হলে আঁতকে উঠত। কিন্তু গোলোকবিহারী সর্বদা অঙ্কে বিহার করেন বলেই বাস্তব পৃথিবীর ঘটনাগুলো বুঝে উঠতে তাঁর একটু দেরি হল। এই তো কিছুদিন আগে সকালের দিকে একটা লোক এসে তাকে বলল, "বাবু, গোরু কিনবেন? ভাল দুধেল গোরু বিক্রি আছে।" গোলোকবাবু ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তিত মুখে বললেন, "গোরু? তা কত করে সের?" লোকটা ঘোড়েল। বলল, "তা সের দরে যদি কিনতে চান, তাও দিতে পারি। সস্তাতেই দিয়ে দেব'খন।" গাববু যে তার ছেলে, এটা গোলোকবাবু ভালই জানেন। তবু সেদিন গাববুকে অঙ্ক করাতে বসিয়ে সোজা-সোজা অঙ্ক ভুল হচ্ছে দেখে ভারী রেগে গিয়ে বললেন, "তোমার তো দেখছি অঙ্কে একেবারেই মন নেই। এরকম হলে তো তোমার বাবাকে জানিয়ে দিতে আমি বাধ্য হব।"

গোলোকবাবু দেখতে পেলেন, চিলেকোঠার ছায়ায় একজন লোক যেন একটু আবডাল হয়ে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দূরের জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে আছে। গোলোকবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। সর্বনাশ! এ যে সেই টেকো সাহেব! স্বপ্নে দেখা সাহেব যে সত্যি হয়ে দেখা দিতে পারে এ যে তার কল্পনার বাইরে। ভয়ে গোলোকবাবুর হাত-পা শক্ত হয়ে এল। শিরদাড়া বেয়ে শীতল স্রোত নেমে যেতে লাগল। তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।

ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল সাহেব খুব ধীরে-ধীরে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আবছা আলোতেও ধকধক করছে দু'খানা নীল চোখ। সেই রুখু দাড়ি, সেই জোকবা, সেই টাক!

বুকটা দু হাতে চেপে ধরে বসে পড়লেন গোলোকবিহারী। হার্ট ফেল হয়ে যাবে কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি।

সাহেব ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে এল। লোকটার বিশাল লম্বা এবং কুস্তিগিরের মতো চেহারা। সামান্য আলোতেও ফরসা রং যেন ধপধপ করছে।

গোলোকবাবু হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যেতেন। কিন্তু যেতে-যেতেও গেলেন না। সাহেব তার দিকে একটা খাতা আর পেনসিল বাড়িয়ে দিয়ে তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল।

কিছু না বুঝেও কাঁপা হাতে খাতা আর পেনসিলটা নিলেন গোলোকবাবু। অবাক হয়ে দেখলেন সাদা পাতায় একটা ইকোয়েশন দেওয়া রয়েছে।

বজ্রগম্ভীর গলায় সাহেব একটা আদেশ করল। তার মনে হল, সাহেব তাকে অঙ্কটা কষতে বলছে। মুহূর্তে গোলোকবাবুর ভয়ডর কেটে গিয়ে হাত-পা স্বাভাবিক হয়ে গেল। অঙ্ক! অঙ্ক কষতে বলছে সাহেব! তা হলে আর ভয়টা কীসের? অঙ্ক তো তার অক্সিজেন! আশ্চর্য এই যে, এই অতিশয় ম্লান আলোতেও গোলোকবাবু দিব্যি খাতায় লেখা ইকোয়েশনটা দেখতে পাচ্ছিলেন। বাবু হয়ে বসে উপুড় হয়ে তিনি খসখস করে অঙ্কটা কষে যেতে লাগলেন। মনটা আনন্দে আর উত্তেজনায় ভরে গেল। কারণ, ইকোয়েশনটা অত্যন্ত জটিল এবং বেজায় খটোমটো। আর অঙ্ক যত জটিল আর কঠিন হয়, ততই গোলোকবিহারীর আনন্দ।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল গোলোকবাবুর। কঠিন ইকোয়েশনটা তিনি সাত-আট পাতা ধরে কষে গেলেন। শেষ হওয়ার পর ভারী সঙ্কোচের সঙ্গে সাহেবের দিকে খাতাটা এগিয়ে দিলেন। সাহেব এতক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ করছিল, তিনি টের পাচ্ছিলেন। সেই ভ্রূ কুঁচকেই অঙ্কটা দেখল সাহেব। বেশ খুঁটিয়েখুঁটিয়ে প্রতিটি পাতা ভাল করে দেখে সাহেব যে শব্দটা উচ্চারণ করল তা বুঝতে গোলোকবাবুর অসুবিধে হল না। সাহেব বলল, "হুঁ।"

গোলোকবাবু বুঝতে পারলেন, অঙ্কটা হয়েছে। সাহেব বোধ হয় খুশি হল। খাতা আর পেনসিলটা জোববার প্রকাণ্ড পকেটে পুরে তার দিকে চেয়ে সাহেব খটরমটর করে কী যেন বলে গেল। ভাষাটা জার্মান, গ্রিক বা লাতিন হতে পারে, আবার তামিল, তেলুগু হওয়াও বিচিত্র নয়। সে যাই হোক, ভাষা বোধগম্য না হলেও গোলোকবাবু আন্দাজ করলেন সাহেব বলতে চাইছে, "তুমি অঙ্কটা কষতে পেরেছ বলে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি।"

গোলোকবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন, "দরকার হলে আমি তোমাকে আরও অঙ্ক কষে দেব সাহেব। তোমাকে একদিন স্বপ্নে দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম। ফের চর্মচক্ষে দেখেও ভয় লাগছে। তুমি আসলে কে সাহেব? ভূত-প্রেত নও তো!"

সাহেব চিন্তিত মুখে ফের গ্যাটম্যাট করে কথা কইতে লাগল। গোলোকবাবু এবার যেন কথাগুলোর একটা আঁচ পাচ্ছিলেন, যা বুঝলেন তার মানে দাঁড়ায়, "সেদিন তুমি যা দেখেছিলে, তা সবটাই স্বপ্ন নয়। তোমাকে আমি সত্যিই দেখা দিয়েছিলাম। আমরা মানুষের স্বপ্ন ভেদ করে ঢুকে যেতে পারি। আর আজ যাকে দেখছ, এই আমিও আবার পুরোপুরি সত্য নই, খানিকটা সত্যমাত্র। আমরা একজন পলাতককে খুঁজছি। সে কোথায় আছে, তা আমরা জানি না। সে নানা জটিল অঙ্কের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তার নাগাল পেতে হলে আমাদের আরও অনেক অঙ্ক কষতে হবে। আজ তোমাকে যে অঙ্কটা কষতে দিয়েছিলাম, সেটা ওই সব অঙ্কেরই একটা। তবু সে এখনও অনেক দূরে, আমাদের কোনও সেন্সরেই তার অস্তিত্ব ধরা পড়ছে না।"

গোলোকবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল। তিনি কি সত্যিই লোকটার কথা বুঝতে পারছেন? নাকি আগড়ম বাগড়ম কল্পনা করে নিচ্ছেন পাগলের মতো? তিনি ভাষাবিদ নন, তা হলে ওই অজানা ভাষার মর্মোদ্ধার করছেন কী করে?

সাহেব আবার তার বিচিত্র ভাষায় কথা বলছিল এবং গোলোকবাবুও তার মানে বুঝতে পারছিলেন। লোকটা বলছে, "তুমি সত্যিই একজন অঙ্কের মানুষ। এরকম কঠিন অঙ্কের সমাধান করা সহজ কাজ নয়। তোমাদের অনুন্নত মস্তিষ্কের পক্ষে তো নয়ই। তুমি আমাকে অবাক করেছ।"

গোলোকবাবু মাথা চেপে ধরে বসে রইলেন। না, না, তিনি আসলে কিছুই বুঝতে পারেননি। বোধ হয় মাথাটা তার বিগড়েই গিয়েছে।

সাহেব যেন তাকে আশ্বস্ত করেই বলল, "না, তুমি ঠিকই আছ, পাগল হওনি।"

আস্তে-আস্তে গোলোকবাবুর চোখের সামনে আস্ত সাহেবটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। গোলোকবাবু অবাক হয়ে বললেন, "এটা কী হচ্ছে সাহেব ? এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড ?"

"তোমাকে তো বলেছি আমি পুরোপুরি সত্য নই। আমি আছি, আবার নেইও।"

"ভূত নও তো।"

"ভূত কাকে বলে আমি জানি না। তুমি তো অঙ্ক জান, মনে করো আমি অঙ্কের মতোই অ্যাবস্ট্রাক্ট।"

সাহেব হাওয়ায় গায়েব হয়ে গেল। অবিশ্বাসের চোখে সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন গোলোকবিহারী। নাঃ, তিনি ফের স্বপ্নই দেখছেন, এসব তো আর সত্যি হতে পারে না।

চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলেন। ভূতে তিনি বিশ্বাস করেন না ঠিকই, কিন্তু আজ কেন যেন ধন্দ লাগছে। মাথাটা বড্ড গরম। বুকের ধড়ফড়ানিটাও আছে। কয়েক গ্লাস জল খেয়েও তেষ্টা যেন ঠিক মিটছে না।

লেখাপড়া করার টেবিলে এসে গোলোকবাবু ফের হা! কে যেন একটা সাদা কাগজ টেবিলে রেখে গিয়েছে। তাতে নতুন একটা ইকোয়েশন।

৩

মনসা ভট্টাচার্য লোকটা ভাল না খারাপ, এটা নিয়ে মানুষের ধন্দ আছে। তবে মনসারাম যে অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাতে কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই। পুঁথিপত্র নিয়েই থাকেন বটে, কিন্তু চোখে ঈগলের মতো নজর। কান সর্বদা সজাগ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রখর। বিড়াল হেঁটে গেলেও শব্দ পান। লোকে বলে গুপ্তিপাড়ার কোন গাছে কটা পাতা আছে, তাও মনসারামের নখদর্পণে। গাঁয়ে একজন বিচক্ষণ মানুষ থাকলে লোকে তার বুদ্ধিপরামর্শ নিতে আসবেই। তাই মনসাপণ্ডিতের কাছে মানুষের যাতায়াতের অভাব নেই। এমনকী চোর-ছ্যাচড়রাও

নাকি গোপনে শলাপরামর্শ করে যায়। মনসাপণ্ডিত কাউকে ফেরান না। সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। সেদিন রাতের দিকে বসে মনসারাম একটা প্রাচীন পুঁথি থেকে পাঠ উদ্ধার করছিলেন, এমন সময় সামনের বন্ধ জানলার ওপাশে একটু মৃদু গলাখাকারির শব্দ হল।

মনসা বললেন, "কে রে?"

অতিশয় মোলায়েম গলায় কে যেন বলল, "পণ্ডিতমশাই কি জেগে আছেন?"

"আছি।"

"আজ্ঞে আমি বেচারাম প্রামাণিক।"

"তা কী মনে করে?"

"আজ্ঞে মুশকিলে পড়ে একটু সাহায্যের জন্য আসা।"

"সাহায্য? কী রকম সাহায্য বাপুঃ টাকাপয়সা নাকি?"

"ব্রাহ্মণেরটা নিলে অখণ্ড নরকবাস। আজ্ঞে না ঠাকুরমশাই। একটা জিজ্ঞাসা ছিল। আজকের তিথিটা কি জানা আছে ঠাকুরমশাই?"

"না জানার কী? আজ নবমী। কৃষ্ণপক্ষ।"

"তাই বলুন। তা ঠাকুরমশাই, কৃষ্ণনবমীতে কি আকাশে জ্যোৎস্না ফোটার কথা?"

"পাগল নাকি? কৃষ্ণনবমীতে জ্যোৎস্না ফুটবে কেন?"

"তা হলে তো বড় মুশকিল হল মশাই! কুলতলির মাঠ দিয়ে আসতে আমি যে স্পষ্ট দেখলুম, সামনের মাঠ জুড়ে এক বাটি পায়েসের মতো জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে!"

"নেশাভাং করলে ওরকম কত কী দেখা যায়।"

"ছোট মানুষদের মুশকিল কী জানেন, তাদের কথায় কেউ আমল দিতে চায় না। তা ঠাকুরমশাই, আমি না হয় ভুল দেখেছি, কিন্তু পাদ্রিসাহেবের তো ভুল হওয়ার কথা নয়।"

"পাদ্রিটা আবার কে হে?"

"আজ্ঞে মস্ত মানুষ, মাথায় টাক, মাঠেঘাটে প্রায়ই দেখা যায়।"

"ওহে বেচারাম, আমি বলি কী, বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, নেশাটা তোমার মাথায় চড়ে গিয়েছে।"

"তাই যাচ্ছি ঠাকুরমশাই, তবে কিনা কথাটা বিশ্বাস করলেও পারতেন।"

বেচারাম প্রামাণিক নামে কাউকে চেনেন না মনসাপণ্ডিত। মোদো মাতাল হবে ভেবে তার কথাটা আর মনেও রাখেননি।

কয়েকদিন বাদে বিষয়কর্মে বেরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে এক যজমানের বাড়িতে গিয়ে হাজির। যজমানের মেয়ের বিয়ে, তার দিন তারিখ ঠিক করতে হবে। কাজ সেরে ডাবের জল খেয়ে উঠতে গিয়ে খেয়াল হল, এ বাড়ির একরকম পাশেই কুলতলির মাঠ। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে কৌতুহলের সঙ্গে বললেন, "ওটা কুলতলির মাঠ না?"

যজমান বলল, "আজ্ঞে বটেই তো বাবাঠাকুর। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন কেন?"

"না, এমনিই।"

"না বাবাঠাকুর, এমনি নয়। আপনি সাধক মানুষ। নিশ্চয়ই কিছু টের পেয়েছেন।"

"কী টের পাব?"

"ক'দিন আগে মাঝরাত্তিরে হঠাৎ কুলতলির মাঠে খুব আলো হল। সে এমন আলো যে, পুন্নিমেকে হার মানায়! আমরা তো ভয়ে জড়সড়।"

মনসারাম গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু বললেন না। দিন দশ-বারো পর আবার এক রাতে জানালার ওপাশে খুক করে একটু গলাখাকারির শব্দ।

"কে রে?"

"ঠাকুরমশাই কি জেগে আছেন?"

"বেচারাম প্রমাণিক নাকি হে!"

"কী ভাগ্যি আমার, চিনতে পেরেছেন!"

"দাঁড়াও বাপু। দরজা খুলে দিচ্ছি। ভিতরে এসো।"

"দিনকাল ভাল নয়, ঠাকুরমশাই। যাকে তাকে হুট করে ঘরে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে না। তা ছাড়া আপনি শুদ্ধাচারী মানুষ, আমাদের মতো পাপী-তাপীদের হাওয়া-বাতাস আপনার গায়ে লাগা ঠিক নয়।"

"ও বাবা! তোমার যে জ্ঞানের নাড়ি টনটনে!"

"কী যে বলেন ঠাকুরমশাই। জ্ঞানের অভাবেই তো আমাদের যত দুর্গতি। তা ঠাকুরমশাই, অভয় দেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"বলে ফ্যালো।"

"এই ধরুন সিদ্ধিদাতা হলেন গিয়ে গণেশ। লেখাপড়ার দেবতা হলে মা সরস্বতী। পয়সাকড়ির হলেন মা লক্ষ্মী। তা জানতে বড় ইচ্ছে করছে, চুরিবিদ্যের কি কোনও দেবতা নেই?"

"কেন হে বাপু তুমি কি চোর নাকি?"

"তা ধরুন যদি তাই হয়ে থাকি?"

"তা হলে তুমি চোরের সমাজের কুলাঙ্গার! চোর হয়ে চোরের দেবতার নাম জান না?"

"আজ্ঞে সেই পাপেই তো সুযোগ-সুবিধে করে উঠতে পারছি না ঠাকুরমশাই। সুযোগে হাতের মুঠোয় এসেও পাকাল মাছের মতো পিছলে যাচ্ছে।"

"কীরকম?"

"গেল হপ্তায় খগেন গোঁসাই গোরু কিনবে বলে দশটি হাজার টাকা তুলে এনে আলমারিতে রেখেছে বলে পাকা খবর ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ গিয়ে দেখি সেখানে শ্রদ্ধাস্পদ গিরিজা হাড়ি হাজির। নামডাকওয়ালা মানুষ। তার উপর গুরুজন বলে আমি পেন্নাম করতেই খুব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "বাপু রে, তোদের

উঠতি বয়স। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। আর আমাদের তো দিন শেষ হয়েই এল। চোখে ছানি পড়বে, হাঁটুতে বাত ধরবে, হাত কাঁপবে। বুঝলি কিনা, বড় মুশকিলে পড়েছি রে বাপু সামনের মাসেই আমার শালির বিয়ে। গিন্নি ধরেছে, বিয়েতে এক ছড়া হার দিতে হবে। তা কী আর করি বলুন, শত হলেও গুরুজন। তাই বললুম, এ আর বেশি কথা কী, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, অগ্রাধিকার আপনার। গত বুধবার শিবেন বৈরাগীর বাড়িতে বিরাট দাঁও ছিল মশাই। কিপটে শিবেন গত দশ বছর ধরে মেয়ের বিয়ের সোনাদানা কিনছে। তিরিশ-চল্লিশ ভরি হবে বোধ হয়। বুধবার বৈরাগীরা সব উদয়পুরে নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়েছে, বাড়িতে শুধু বুড়ি মা। সুবর্ণ সুযোগ আর কাকে বলে। ছাদের সিঁড়ির দরজা ফাঁক করে ঢুকে দেখি হাসি-হাসি মুখ করে ফটিক তাম্বুলি বেরিয়ে আসছে। আমাকে দেখে বলল,'তুই কী মনে করে? আমি তো সব চেছেপুছে নিয়ে এলুম। আগে যদি বলতিস, তা হলে না হয় খুদকুড়ো একটু পেসাদ বলে রেখে আসতুম। ভদ্রতা করেই বলতে হল, না-না খুড়ো, আপনাদের কোলেপিঠেই তো বড় হয়েছি।" বিদ্যাধরপুরের সতীশ বাশুই তো তিসির তেল বেচে মাসটাক আগে দেড় লাখ টাকা পেয়েছে। পায়ের কাছে সিন্দুকে রাখা। সুলুকসন্ধান সব জানা। রাত দুটোর সময় গিয়ে দেখি, পথ পরিষ্কার, কোথাও কোনও বাধা নেই। খিড়কির দোর সবে খসাতে যাব, ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে ক্যাঁক করে ঘাড়টা কে যেন চেপে ধরে বলল, "এই, ঘরে ঢুকেছিস যে বড়! তুই কি ভূমিপুত্তুর? বড় রাগ হল মশাই। সকালেও দেখেছি বিদ্যাধরপুরের একটা কাক এসে গুপ্তিপাড়ার মরা ইঁদুর মুখে করে নিয়ে গেল। গুপ্তিপাড়ার কোকিল গিয়ে বিদ্যাধরপুরে গান শুনিয়ে আসে। পাশাপাশি ভাইবোনের মতো দুটি গ্রাম। খাড়াখাড়ি কীসের? তা জাম্বুবানটা কোনও কথাই কানে তুলল না। রাদ্দা দিয়ে বের করে দিল। তাই বলছিলাম আজ্ঞে, সময়টা ভাল যাচ্ছে না, একটু ঠাকুর-দেবতাকে ডেকে দেখি।"

"তা ডেকে দেখতে পার। চোরের দেবতা হল কার্তিক। একথা আনাড়ি চোরও জানে।"

"বড্ড উপকার করলেন কর্তা। দেবদ্বিজে ভক্তি না থাকলে কোন কাজটা হয় বলুন!"

"তা বটে।"

"আর একটা ধন্দে পড়েছি। সেইটে একটু নিবেদন করি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

"প্রথমে পাশাপাশি দুটো ফুটকি। তারপর একটা চতুর্ভুজ, তারপর উপর নীচে তিনটে তারা, দুটো ঢ্যাড়া, বাঁকা চাঁদ... কেন্নার মতো পাক খাওয়া একটা গোল চিহ্ন, তারপর একটা তিরচিহ্ন, আর তারপরেই একটা ত্রিভুজ। ব্যাপারটা কিছু বুঝলেন?"

"না হে বাপু, মাথায় তো কিছুই সেঁধল না। এ জিনিস কোথায় পেলে?"

"সেইটেই তো ভাবনার কথা ঠাকুরমশাই। আচ্ছা, এটা কি কোনও অঙ্ক? নাকি কোনও সাংকেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে?"

"ভেবে দেখতে হবে হে।"

"একটু ভাবুন ঠাকুরমশাই। আজ তা হলে আসি।"

তা ভাবলেন মনসারাম। ভেবে আর-একবার মনে হল, বেচারাম লোকটা আসলে পাগল। কিন্তু আরও একটু ভাবতে গিয়ে মতটা পালটাতে হল। পাগল নয়, বেচারাম খুবই সেয়ানা। হেঁয়ালি জিনিসটা মনসারামের অপছন্দ নয়। একটা কাগজে তিনি হেঁয়ালিটা লিখেও ফেললেন। দুটো ফুটকি, একটা চতুর্ভুজ, তিনটে তারা, দুটো ঢ্যাড়া, বাঁকা চাঁদ, কেন্নোর মতো পাক খাওয়া বৃত্ত, তীরচিহ্ন, ত্রিভুজ। গুপ্তধনের সংকেত হওয়া বিচিত্র নয়। নয়তো লোককে বোকা বানানোর ফন্দি। ভ্রু কুঁচকে হেঁয়ালিটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মনসাপণ্ডিত।

আজ সকালে উঠে গোলকাবিহারী হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছেন। আর হাঁটা বলতে বাবুয়ানি হাঁটা নয়। খানিকটা দৌড়, খানিকটা হাঁটা, আবার দৌড়। কুলতলির মাঠ পেরিয়ে, বনবাদাড় ঠেঙিয়ে, বিদ্যাধরপুর ছাড়িয়ে কোথায়-কোথায় যে চলেছেন, তা নিজেও বুঝে উঠতে পারছেন না। শুধু এটা বুঝতে পারছেন যে, তার পেটে বায়ু হচ্ছে। আর বায়ু থেকে উর্ধ্ববিকারে তার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। এবং ফলে তিনি ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখছেন। আর এই সবের জন্য দায়ী হল অঙ্ক। অঙ্কের নেশা ছাড়তে না পারলে তিনি বোধ হয় পাগলই হয়ে যাবেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা অঙ্ক তাকে রেহাই দিচ্ছে কই? যেখানে চোখ পড়ছে সেখানেই ওয়ান, টু, থ্রি, এক্স, ওয়াই, জেড, আলফা, থিটা, গামা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, উপবৃত্ত দেখতে পাচ্ছেন। ঘাসে, মাটিতে, গাছের ডালে, পাতায়, আকাশে মেঘের আকৃতির মধ্যে। এমনকী, পাখির ডাক, বাতাসের শনশন বা জঙ্গলের মর্মধ্বনি তার মধ্যেও চোরা অঙ্কের ফিসফাস। পালানোর কি জায়গা নেই তার? অঙ্কের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি না হলে যে তিনি মারা পড়বেন।

জীবনে এক লপ্তে এত হাটেননি গোলোকবাবু। আসলে অঙ্কের নেশায় তার প্রাতঃভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণ হয় না। নড়াচড়া করা তার বিশেষ পছন্দের ব্যাপার নয়। সারাদিন ঘাড় গুজে অঙ্কে ডুবে থাকাতেই তার যত আনন্দ। আর সেই জন্যই কি প্রকৃতি আজ প্রতিশোধ নিতে লেগেছে? হাঁটতে-হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়েছেন গোলোকবাবু। ঘাসে জামা-গেঞ্জি ভিজে সপসপ করছে। শরীরের গাটে-গাটে ব্যথা, পায়ে ফোস্কা। তবু মাথা ঠান্ডা হচ্ছে না। তার আশপাশে হাওয়ায় যেন আঁশের মতো অঙ্ক ভেসে বেড়াচ্ছে, পায়ের ফাঁকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে খরগোশের মতো। কী জ্বালা!

নিতান্তই হেদিয়ে পড়ায় একটা গাছের তলার ছায়াতে বসে হ্যা হ্যা করে দম নিচ্ছিলেন গোলোকবাবু। হঠাৎ নজরে পড়ল সামনে ধুলোর উপর বিস্তর আঁকিবুকি। আর সর্বনেশে ওই সব আঁকিবুকির ভিতর থেকে লুকোনো অঙ্ক টুকি দিচ্ছে যেন। হ্যাঁ, ওই তো এক্স টু দ্য পাওয়ার থারটিন মাইনাস ওয়াই... তড়িঘড়ি

উঠে আবার হাঁটা লাগালেন গোলোকবাবু। না, আর পেরে উঠছেন না তিনি। এই পরিণতি হবে জানলে তিনি জীবনে অঙ্কই শিখতেন না। অঙ্ককেই জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করতেন তিনি। সেই বন্ধুই যে ক্রমশ শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত! দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস নেই! যখন বেশ একটু বেলার দিকে বাড়িতে ফিরলেন, তখন বাড়ির লোক সবাই উদ্বেগে বাইরে এসে জড়ো হয়েছে। পাড়ার লোক বেরিয়ে পড়েছে তাকে খুঁজতে। তাকে দেখেই সবাই সমস্বরে প্রশ্ন ছুড়তে শুরু করল, "কোথায় গিয়েছিলে? কেন গিয়েছিলে? এত দেরি হল কেন?"

গোলোকবাবু কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারলেন না। শুধু হাঁপাতে-হাঁপাতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। দু'-তিন গ্লাস জল খেয়ে পাখার হাওয়ায় একটু ধাতস্থ হলেন। সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, "নাঃ, ভাবছিলাম, এখন থেকে একটু মর্নিং ওয়াক করা দরকার। তাই…"

জড়ো হওয়া লোকজনের ভিতর থেকে মনসারাম এগিয়ে এসে বললেন, "ওহে গোলোক, সকালে একটু দরকারে পড়েই তোমার কাছে এসেছিলাম। তা এসে দেখি, বাড়িতে প্রায় কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছে। পড়ারই কথা। আমাদেরও ভারী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। জীবনে যে কখনও এক সঙ্গে দশ পা হাটনি, সে হঠাৎ হাঁটতে বেরিয়ে পড়ল কেন?"

গোলকবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "আহা, দুশ্চিন্তা করার কী আছে!"

"আছে হে বাপু, আছে। হাতি ঘাড় ঘোরাতে পারে না বলে বুঝতে পারে না সে কত বড়। তোমারও সেই অবস্থা। সারাদিন লেখাপড়ায় বুদ হয়ে থাকো বলে টের পাওনা যে, তুমি একটা কত বড় প্রতিভা। তোমার মতো একজন জিনিয়াসকে কবজ করার সুযোগ পেলে কি কেউ ছাড়বে?"

এসব কথা শুনে গোলোকবাবু মোটেই খুশি হলেন না। যেন আরও শুকিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

"অঙ্কের এমন মাথা দুনিয়ায় ক'টা লোকের আছে বলো তো।"

অঙ্ক শব্দটা শুনেই কানে হাতচাপা দিয়ে গোলোকবাবু ককিয়ে উঠলেন। বললেন, "না, না, ওসব আমি ভুলে গিয়েছি।"

"কী ভুলে গিয়েছ?"

গোলোকবাবু আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "না ভাই, অঙ্ক বলে কিছু নেই। ছিলও না কখনও। ভবিষ্যতেও থাকবে না।"

"বল কী হে! আমরা তো জানি অঙ্কময় জগৎ।"

গোলোকবিহারী বললেন, "ভুল জান। অঙ্ক একটা ফক্কিকারি ছাড়া কিছু নয়। ও হল মরীচিকা, মায়াহরিণ, সোনার পাথরবাটি, ডোডোপাখি, রূপকথার গপ্পো, চাঁদের বুড়ি, হাওয়ার নাড়ু…"

মনসারাম কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর মাথা চুলকে বলেন, "তাই তো হে, মেধা নিষ্কাশনের কথা শুনেছিলুম বটে, এতদিনে প্রত্যয় হল। আমাদের আশঙ্কাই তো সত্য হয়ে দাঁড়াল দেখছি। তোমাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে

কি আজ মেধা নিষ্কাশন করেছে? এ তো পরিষ্কার ব্রেনওয়াশ! ব্যাপারটা একটু খুলে বলো তো গোলোক। তোমার হয়েছেটা কী?”

গোলোকবাবু গুম হয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না। মনসারাম একটা ভাঁজ করা কাগজ খুলে গোলোকবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “এটা একটু দ্যাখো তো গোলোক, মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পার কিনা। এটার জন্যই সকালে ছুটে এসেছিলাম।”

গোলোকবাবু কাগজটার দিকে তাকালেন না। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে বললেন, “কী আছে ওই কাগজে?”

“বোধ হয় একটা হেঁয়ালিই হবে।”

“আমি আজকাল কাগজটাগজের দিকে তাকাতে ভয় পাই।”

“ভয় পাও? ভয়ের কী আছে?”

“কোথায় কোন অঙ্ক সাপের মতো লুকিয়ে আছে কে জানে বাবা!”

“অঙ্কের উপর তোমার হঠাৎ এত বিরাগের কারণটা কী?”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলোকবাবু বলেন, “অঙ্কের নেশায় আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি ভাই মনসা। আমার আজকাল হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। একজন সাহেব এসে আমাকে দিয়ে নানরকম অঙ্ক করিয়ে নিচ্ছে। আমার টেবিলে গিয়ে দেখতে পাবে, গত সাত দিনে আমাকে দিয়ে শ’ দেড়েক কঠিন অঙ্ক করানো হয়েছে। আসলে আমার মাথার বিকার হচ্ছে। আমি নিজেকে দিয়ে ওসব করাচ্ছি।”

“সাহেব। কীরকম সাহেব বলো তো! পাদ্রি? মাথায় টাক?”

গোলকবাবু ভঅরী অবাক হয়ে বললেন,“তুমি জানলে কী করে?”

মনসারাম চিন্তিত ভাবে বললেন, “দ্যাখো গোলোক, ওটা তোমার হ্যালুসিনেশন বলে আমার মনে হচ্ছে না। আর যদি হয়েও থাকে, তবে হ্যালুসিনেশন তোমার একার হয়নি। আরও একজনের হয়েছে।”

গোলোকবাবু চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, “কে দেখেছে?”

“তাকে তুমি চিনবে না। তার নাম বেচারাম প্রামাণিক। সম্ভবত সে চোর। তবে মানুষ খুব সেয়ানা।”

“সত্যি বলছ ভাই? আমি ভুল দেখছি না?”

“সত্যি বলছি। পাদ্রিসাহেবকে বেচারাম দেখেছে।”

“কিন্তু সেটা তো আরও ভয়ের কথা হল। কারণ, সাহেব বারবারই আমার কাছে আসে। আমাকে দিয়ে অঙ্ক করিয়ে নেয়।”

“অঙ্ক করায় কেন?”

“ভগবান জানে। তবে সাহেব নাকি একজন ফেরারিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই ফেরারি নাকি নানারকম জটিল অঙ্কের ভিতরে লুকিয়ে আছে। অঙ্ক দিয়েই তাকে ধরা সম্ভব। এ সব কি অত্যন্ত গোলমেলে কথা নয়?”

“হু। খুবই গোলমেলে। কিন্তু ভাই আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না। আমাদের মস্তিষ্কের বাইরেও জগতে অনেক কিছু আছে।”

"তা আছে। কিন্তু সাহেব নিজেই আমাকে বলেছে, সে সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়। এইসব শুনেই আমার মাথাটা বড় গুলিয়ে গিয়েছে।"

"অস্থির হয়ো না গোলোক। তোমার মাথার গন্ডগোল হয়নি। সাহেব হোক আর যে-ই হোক, কিছু একটা আছে। এখন এই কাগজটা একটু দ্যাখো, এটা কি কোনও হেঁয়ালি?"

গোলোক কাগজটার চিহ্নগুলো দেখলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, "কতগুলো চিহ্ন আছে, যা বিশ্বজনীন। এগুলো সংখ্যার বা অক্ষরের মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই চিহ্নগুলি নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। এসব হয়তো সংখ্যা, হয়তো অক্ষর বা অর্থবাহী সংকেত। ডিকোড যারা করতে পারে, তারা হয়তো বুঝবে। এই ধাঁধা তোমায় কে দিল?"

"সে আছে একজন। তুমি স্নান করে, খেয়ে, বিশ্রাম নাও। নিশ্চিন্তে থাকো, তোমার মাথার কোনও বিকার হয়নি। আর অঙ্ক তোমার শত্রু নয়।"

কিন্তু গোলোকবিহারী ভরসা পেলেন বলে মনে হল না। জানালার পাশে পেয়ারা গাছটায় একটা মাকড়সা জাল বুনছে। সেদিকে তাকিয়ে গোলোক নির্ভুল দেখতে পেলেন, জালটায় ছোট-ছোট অঙ্কের পোকা আটকে রয়েছে। তিনি শিউরে উঠে চোখ বুজলেন।

রাতের দিকটায় আজও ফের জানালার বাইরে খুক করে একটু গলা খাকারির শব্দ হতেই মনসাপণ্ডিত বললেন, "বেচারাম নাকি হে?"

"যে আজ্ঞে পণ্ডিতমশাই। ওঃ, কী উপকারটাই যে করলেন, শতমুখে বলে শেষ করা যায় না।"

"উপকার! উপকার আবার কখন করলুম!"

"ওই যে, চোরের দেবতা যে কার্তিক ঠাকুর, সেটা ধরিয়ে দিলেন। তা কার্তিকবাবার পুজো করে খুব উপকার হচ্ছে মশাই! যেন চিচিং একদম ফাঁক হয়ে বসে আছে।"
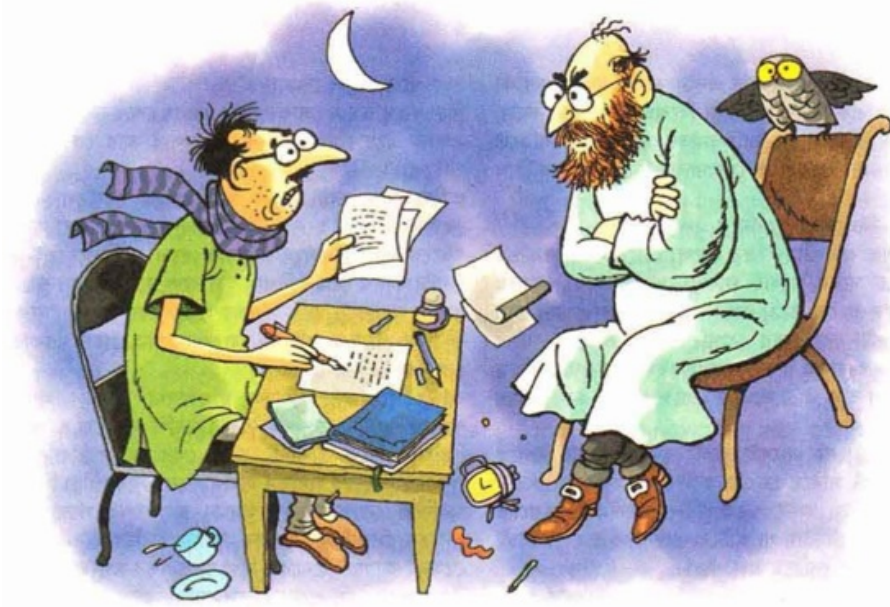
“বটে!”

“তবে আর বলছি কী মশাই। রোজ রাতে সিঁদকাঠি নিয়ে বেরচ্ছি আর রোজই যেন কার্তিকবাবা মুঠো-মুঠো ঢেলে দিচ্ছেন।”

“তা হলে তোমার সময়টা ভালই যাচ্ছে, কী বলো?”

“তা আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আর কার্তিকবাবার দয়ায় একটু খুদকুড়ো জুটছে।”

“বেচারাম, একটা কথা সত্যি করে বলবে?”

“যে আজ্ঞে !”

“ওই যে হেঁয়ালিটা আমাকে শুনিয়ে গেলে, সেটা কোথায় পেয়েছ?”

বেচারাম একটু চুপ করে থেকে বলল, “ঠাকুরমশাই, আপনার কি ভাইপো আছে?”

মনসারাম অবাক হয়ে বলেন, “ভাইপো! হঠাৎ ভাইপোর খবর চাইছ কে হে?”

“আজ্ঞে, আমার কোনও ভাইপো নেই কিনা, তাই। ভাইপো তো দূরের কথা, আমার ভাই-ই নেই। আর ভাই তো দূরস্থান, আমিই তো হচ্ছিলুম না। আমার মা-বাবা বিস্তর মানত, মাদুলি করে, জলপড়া খেয়ে যখন হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, তখনই আমি হলুম।”

“অ। তা হলে বলি বাপু, আমার বেশ কয়েকটা ভাইপো আছে। তাতে কি তোমার কোনও সুবিধে হল?”

“তা হল। আসলে ভাইপো না থাকলে ভাইপোর মর্ম বোঝা যায় না কিনা।”

“হেয়ালির সঙ্গে ভাইপোর সম্পর্ক কী?”

“কিছু না ঠাকুরমশাই, কিছু না। ভাইপো সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে পরে আরও ভাল করে জেনে নেবখন। ভাইপো ব্যাপারটা যে হেঁয়ালি নয়, সেইটে ভাল

করে বোঝা দরকার।”

“তুমি হেঁয়ালির কথাটা পাশ কাটাতে চাইছ নাকি বেচারাম?”

“আজ্ঞে না ঠাকুরমশাই। লুকোছাপার ব্যাপার নেই। মাসখানেক আগে হালুইপাড়ার শশী বাউরির বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো ছিল। তা সিন্নিটা যা হয়েছিল ঠাকুরমশাই, বলে বোঝাতে পারব না। ঘন দুধ, পাকা মর্তমান কলা, নারকেল দিয়ে সে এক জম্পেশ ব্যাপার। খাওয়ালও পেট ভরে। আমরা গরিব মানুষ, যাই পাই পেট পুরে খেয়ে নিই। তাতে রাতের খোরাকিটা বাঁচে, বুঝলেন কিনা।”

“বুঝেছি।”

“তা সিন্নি খেয়ে একটু রাত করেই ফিরছিলুম। হালুইপাড়া পেরিয়ে কুমোরপাড়ার পতিত জমিটার ধার দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে। আর হঠাৎ দেখতে পেলুম জ্যোৎস্নায় সাদামতো কীসব যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। ঠাহর করে দেখলুম, বাতাসের গায়ে কেমন যেন আঁকিবুকি। যেন কেউ চকখড়ি দিয়ে শূন্যে কিছু লিখছে। তাজ্জব হয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছি, তখনই দেখলুম, জমির উলটো দিকটায় একটা ঝোপের ছায়ায় রোগামতো কে যেন দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে বাতাসে কীসব আঁকছে। আর সেগুলো দিব্যি বাতাসের গায়ে আঁকা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

“এরকম কি হয় বেচারাম ?”

“আজ্ঞে আমারও তো একই প্রশ্ন ঠাকুরমশাই। এরকম কি হয়? তাই আবডাল হয়ে ভাল করে ব্যাপারটা লক্ষ করলাম। আর হেঁয়ালিগুলো মনের মধ্যে টুকে নিলাম।”

“তোমার চোখ আর স্মৃতিশক্তি তো খুবই ভাল বলতে হবে।”

“আজ্ঞে, ওইটেই তো আমার দোষ। যা কানে শুনি আর যা চোখে দেখি, তা সব বড্ড মনে থাকে।”

৪

লোকে তার সম্পর্কে উলটোপালটা নানা কথা কয় বটে, কিন্তু বিশ্বেশ্বর জানে, তার প্রাণে মায়াদয়া আছে। সে সকালে কাককে বাসি রুটি খাওয়ায়, দুপুরে পাতের ভাত নেড়ি কুকুরদের দেয়, কাঙাল ভিখিরিদেরও ফেরায় না। জমিজমার মামলায় হাজিরা দিতে এক সকালে মোটরবাইকে চেপে সদরে যাচ্ছিল বিশ্বেশ্বর। তখনই বড় ঝিলের ধারে একটা শিমূল গাছের তলায় ভারী রোগা চেহারার ল্যংব্যাগে ছেলেটাকে দেখতে পায় সে। চুপ করে বুকে হাঁটু জড়ো করে বসে আছে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় পেটে দানাপানি নেই। তাড়া ছিল বলে বিশ্বেশ্বর আর দাঁড়ায়নি। কাছারি সারতে বেলা গড়িয়ে গেল। ফেরার সময় সন্ধে হয়-হয়।

তখনও দেখে সেই ছোকরা একইরকম ভাবে বসে আছে। এক চুল নড়েনি। পরনে একটা সাদা খোলের মতো বেঢপ পোশাক। জামাপ্যান্ট জোটেনি বলেই বোধ হয় বালিশের খোলই গায়ে চাপিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। বিশ্বেশ্বর বাইক থামিয়ে হাতছানি দিয়ে ছোকরাকে ডাকল। ছেলেটা কেমন যেন একটু টাল খেয়ে উঠে দাঁড়াল। বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি হবে না। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রংটা ফরসার দিকে। ল্যাকপ্যাক করতে-করতে এগিয়ে এল। কাছে এসে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিল।

"নাম কী তোর?"

ছেলেটা যেন প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না। আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কী যেন একটা বলল। শোনাল অনেকটা যেন, "পাউচিই।"

"কোথায় বাড়ি তোর? এখানেই বা বসে আছিস কেন?"

ছেলেটা কাহিল মুখে ভারী গোলমেলে একটা ভাষায় খানিকক্ষণ কী যেন বলে গেল, তার এক বিন্দুও বুঝল না বিশ্বেশ্বর। অনুমান করল, ছোকরা বাঙালি নয়। কেরল বা তামিলনাড়ুর হবে। তার বাড়িতে কাজের লোকের অভাব আছে। এই ছোকরাকে নিয়ে গেলে সুবিধে হতে পারে। ছেলেটাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে এল বিশ্বেশ্বর। দেখা গেল, ভারী শান্ত আর ভীষণ ভিতু ছেলে। চোখে সর্বদা ভয়-ভয় ভাব। বাইরের চেয়ে ঘরের মধ্যেই থাকতে পছন্দ করে। কোনও জোরালো শব্দ শুনলে চমকে ওঠে। কেউ তাকে ডাকলে কেমন যেন থতমত খায়। চেহারাটা দুর্বল আর রোগা বলে বিশ্বেশ্বরের বাড়ির লোকেরা তাকে শক্ত কাজকর্ম দিত না। ফাইফরমায়েশ খাটত। কিন্তু ভাষা বুঝতে পারত না বলে বাটা আনতে বললে বালতি এনে হাজির করত।

চৈত্র মাসের ঝড়ে উঠোনের পাশেই একটা বড় জাম গাছ উপড়ে পড়েছিল। গাছটা কেটে সরিয়ে নেওয়া হলেও গাছের মস্ত গুড়িটা যাতায়াতের পথটা খানিক আটকে রেখেছিল। সেদিন বিশ্বেশ্বরের মেজো ভাই তাড়াহুড়োয় গুড়িটায় পা আটকে পড়ে হাত ভাঙল। হইচই শুনে চাকরদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচু। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা নীরবে দেখল। তারপর হঠাৎ ল্যাকপ্যাক ভঙ্গিতেই এগিয়ে এসে তার রোগা দু'খানা হাতে বিশাল গাছের গুড়িটা ধরল এবং বিনা কসরতে, একটুও কষ্ট না করেই ধাঁ করে কয়েক মণ ওজনের গুড়িটা তুলে নিয়ে বাগানের বেড়ার ধারে রেখে এল। বাড়ির মেয়েপুরুষ সবাই হা করে বাক্যহারা হয়ে দৃশ্যটা দেখল! বিশ্বেশ্বরের মা আতঙ্কিত গলায় বললেন, "ও বাবা বিশু, এ তো মনিষ্যি নয়! কোন অপদেবতাকে ঘরে নিয়ে এলি বাবা?"

পরের কাণ্ডটা ঘটল মাসখানেক বাদে। বিশ্বেশ্বরের সেজো ভাই কাশীশ্বরের ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক করতে ঠাকুরমশাই হরপ্রসন্ন চক্রবর্তী এসেছিলেন। তিনি বিদায় নেওয়ার পর দেখা গেল, ছাতাখানা ভুল করে ফেলে গিয়েছেন। কাশীশ্বরের বউ মাধবী তাড়াতাড়ি ছাতাখানি পাঁচুকে দিয়ে বলল, "যা ভাই পাঁচু, ওই যে ঠাকুরমশাই মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছেন, দৌড়ে গিয়ে ছাতাখানা দিয়ে আয়।"

দৃশ্যটা জীবনে কখনও ভুলবে না মাধবী। ঠাকুরমশাইকে অন্তত সিকি কিলোমিটার দূরে দেখা যাচ্ছিল। মাধবী বোধ হয় দু কী বড় জোর তিনবার চোখের পলক ফেলেছে, দেখতে পেল পাঁচু ঠাকুরমশাইয়ের ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে ঠিক ফের দুই কি তিন পলকের মধ্যে ফিরে এ বাড়িতে। মাধবী পাঁচুর হাতটা ছুয়ে বলল, "হ্যাঁ রে, তুই সত্যিই মানুষ তো! বেহ্মদত্যি নোস তো ভাই?"

রোজই বিকেলে পাশের মাঠে ফুটবল খেলা হয়। ওই সময়ে পাঁচু গিয়ে খুব কৌতুহলেল সঙ্গে প্রায়ই খেলা দেখে। দিনদশেক বাদে একদিন একটা ছেলে তাকে বলল, "খেলবি?"

পাঁচু এক গাল হেসে রাজি। কিন্তু সে মাঠে নামার পর সব কিছু যেন তছনছ হয়ে গেল। পাঁচুকে আটকানো দূরে থাক, তার দৌড়ের সামনে প্রতিপক্ষ খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছিল। শটের জোর এমনই সাঙঘাতিক যে, এ গোলকিপারের হাটু ভাঙল, গোলপোস্টে দেখা দিল চিড়। ম্যাচটায় একাই চার-চারটে গোল করল পাঁচু। সেই দিনই গুপ্তিপাড়ায় হইহই। ক্লাবঘরে মিটিং বসে গেল আর সেই মিটিংয়ে বিশ্বেশ্বরকে তলব করে নিয়ে যাওয়া হল, আগের দিনই গদাধর লিগের খেলায় কুঞ্জপুরের কাছে গুপ্তিপাড়া পাঁচ গোলে হেরে এসেছে। ফলে সকলেরই মন-মেজাজ খারাপ ছিল। মাতব্বরদের একজন গুপি সরকার বলল, "এমন একটা ট্যালেন্টকে কি লুকিয়ে রাখতে হয় হে?"

বিশ্বেশ্বর বলল,"আজ্ঞে লুকিয়ে তো রাখিনি! নতুন এসেছে, তার উপর বেজায় লাজুক।"

"তা একে পেলে কোথায়?"

বিশ্বেশ্বর বুদ্ধিমান লোক। পাঁচুর এলেম দেখে সে আগে থেকেই একটা সম্পর্ক এঁচে রেখেছিল। বলল, "পাব আর কোথায়! পাঁচু আমার ভাইপো।"

অনিল ঘোষ ভারী অবাক হয়ে বলল, "ভাইপো! বলো কী হে? তোমার ভাইপো হলে তামিল, তেলুগু ভাষায় কথা কয় কেন?"

"আজ্ঞে আমার মাসতুতো দাদার ছেলে। তামিলদেশেই মানুষ কিনা।"

কথাটা কারও তেমন বিশ্বাস হল বলে মনে হল না। তবে আর কথাও বাড়াল না কেউ।

গুপি সরকার গম্ভীর হয়ে বলল, "মুখের কথা দিয়ে কী হবে, পা কথা কইলেই হল। আমাদের প্লেয়ার দরকার, প্রোফেসর তো নয়।"

বাড়ির বুড়োকর্তা সনাতন হাওলাদার বহুকাল আগেই গৃহত্যাগ করেছে বটে, তবে খুব একটা বেশি দূর যেতে পারেনি। বাড়ির পিছনের দিকে বাঁশবন, সেটা পেরলেই পারিবারিক পুকুর আর পুকুরের ওধারেই সনাতন হাওলাদারের সাধনপীঠ। নিরিবিলি জায়গা। চারদিকে ঝোপঝাড়, বনবাদাড়। জপতপের পক্ষে আদর্শ জায়গা।

তেমনই আবার অনেকের বিশ্বাস, সনাতন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল লয় করে দিতে পারে। সে শূন্যে ভেসে থাকে, জলের উপর হাঁটে, ভূতপ্রেত এসে তার চাকর খেটে

যায়। মারণ-উচাটন-বশীকরণে নাকি সনাতন সিদ্ধাই সিদ্ধহস্ত। তা বলতে নেই, সনাতনের বেশ কিছু চেলাচামুণ্ডা আছে। আর কবচ, মাদুলি, জলপড়া, ধুলোপড়া, ভাগ্যবিচার এসবের জন্যও তার সাধনপীঠে বেশ ভিড় হয়। দোহাত্তা রোজগার। সবকিছু সামাল দেয় সনাতনের দুই চেলা কালী আর বটু।

সেদিন একটু রাতের দিকে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সনাতন জপতপ করছিল। রোজই সনাতনের সঙ্গে প্রেতলোকের যোগাযোগ হয়। কাছেপিঠে যারা থাকে, তারা নাকি এসময়ে বাতাসে বোটকা গন্ধও পায়। জপ করতে-করতে সনাতনের হঠাৎ সেদিন কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। চারদিকে কেমন যেমন গুমোট থমথমে ভাব। জপ চালু রেখেই বা চোখটা সিকিভাগ খুলে সনাতন দেখতে পেল, অন্ধকারে সাদা মতো কী সব যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। ধোঁয়া বলেই মনে হল তার। সনাতন হেঁকে বলল, “কালী, গাঁজা খাচ্ছিস নাকি? ধোঁয়া কীসের?”

“আজ্ঞে না বাবা, গাঁজা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। ধোঁয়া তো দেখতে পাচ্ছি না বাবা!”

সনাতন ফের চোখ বুজে জপ করতে-করতে সন্দেহবশত চোখ খুলে আঁতকে উঠে দেখল, সুমুখে বাতাসে একটা সাদা, ধোঁয়াটে ত্রিভুজ ভেসে আছে।

“বাপ রে!” বলে চেঁচিয়ে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল সনাতন। দাওয়ায় কালী আর বটা শুয়ে ছিল। তারা ধড়ফড় করে উঠে বসে বলল,“কী হল বাবাঠাকুর?”

“ভূত। ভূত!”

ত্রিভুজটা বাতাসে একটু হেলদোল খেল, তারপর মিলিয়ে গেল। কালী আর বটা এসে তাকে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে বলল, “বাবাঠাকুরের বোধ হয় আজ জপতপ করতে-করতে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। স্বপ্নই দেখেছেন বোধ হয়।”

সনাতন খুব একটু প্রতিবাদ করল না। চার-পাঁচদিন পর সনাতন রাতের দিকে বসে একটা বগলামুখী কবচ তৈরি করছিল। শরৎকাল। বাতাসে একটু হিম ভাব আছে। চারদিকে গাছপালা আর পুকুর থাকায় একটু কুয়াশাও হয় জায়গায়। বেশ একটু গা ছমছমে ভাব। কোনওদিন করে না, কিন্তু আজ কেন যেন সনাতনের একটু গা ছমছম করছিল। হঠাৎ বাইরে কালীর চিৎকার শোনা গেল, “বাবাঠাকুর। শিগগির আসুন!”

সনাতন আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে তাজ্জব হয়ে দেখল, উঠোনের অন্ধকারে নানা আকৃতির সাদা আঁকিবুকি ভেসে বেড়াচ্ছে। গোল, লম্বা, চৌকো, দড়ির মতো পাকানো, হিজিবিজি নকশা, চন্দ্রবিন্দু। সনাতন আতঙ্কে বাক্যহারা। চোখের পলক পড়ছে না।

কালী আর বটা সমস্বরে চেঁচেয়ে উঠল,“জয়, বাবাঠাকুরের জয়। আজ আপনার মহিমা টের পেলাম বাবা!” বলে কালী আর বটা সনাতনের পায়ের উপর ধড়াস ধড়াস করে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল।

“ওঃ কী দৃশ্যই দেখালেন বাবাঠাকুর।”

নিজের মহিমা তেমন টের পাচ্ছিল না সনাতন। বরং ভয়ে তার গলা শুকনো, বুকে দুরদুরুনি। যদি তার জপতপের ফলেই এই অশৈলী কাণ্ড ঘটে থাকে, তা হলে কাল থেকেই জপতপ কমিয়ে দিতে হবে। খুব কমিয়ে দিতে হবে।

পাঁচু সম্পর্কে হাওলাদারদের বাড়ির লোকেদের নানারকম মনোভাব। বিশ্বেশ্বরের মা নবনীবালা পাঁচুকে নিজেদের ঘরদোরে ঢুকতে দেন না। পাঁচুর ছোঁয়া জিনিস খান না। বলেন, “ও বাবা, যদি গুণ-টুন করে দেয়? ওই রোগা ছেলের গায়ে অত জোর হয় কখনও, ঘাড়ে বেহ্মদত্যি না চাপলে? ওকে বরং শ্বশুরমশাইয়ের সাধনপীঠে পাঠিয়ে দাও। শুনেছি সেখানে ভূতপ্রেতের রাজত্ব।

বাড়ির ছোটদের কাছে পাঁচু একজন হিরো। সুপারম্যান, স্পাইডারম্যানের মতোই কেউ। তারা পাঁচুর কাছে হিরো হওয়ার কায়দাকানুন শিখতেও চায়। কিন্তু পাঁচু বড্ড চুপচাপা। তার কথা তো বোঝবার উপায় নেই এবং সে কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশাও করতে চায় না। ছাদের একখানা একটেরে ঘরে একা থাকে। কেউ ঘরে এলে বিশেষ খুশি হয় না পাঁচু ভয়ও পায়। সে যে বেজায় ভিতু ছেলে, এটা সবাই জেনে গিয়েছে। এই বাড়ির বউ মাধবীর সঙ্গেই পাঁচুর যা একটু ভাব। রোগা, ভিতু ছেলেটার উপর মাধবীর একটু মায়া পড়ে গিয়েছে। যখনই সে ছাদের ভেজা কাপড়জামা মেলতে আসে, তখনই পাঁচুর সঙ্গে একটু কথা কয়ে যায়।

“ও ভাই পাঁচু, সকালে পেট ভরে পান্তাভাত খেয়েছিস তো!”

পাঁচু কি বোঝে কে জানে, তার ভাষায় একটা জবাবও দেয়।

জবাবটা ‘হ্যা’ না 'না' তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু মাধবী তাতে দমে যায় না। বলে, “হ্যাঁ রে পাঁচু, এ বাড়িতে তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো! হলে আমাকে বলিস।”

পাঁচু তার ভাষায় কিছু বলে। মাধবী তখন বলে, “হ্যাঁ রে, তোর গায়ে এত জোর। তুই এত ভাল ফুটবল খেলিস, তা হলে তুই এত ভিতু কেন বল তো! মেঘ চমকালে ডরাস, বাসনের শব্দ হলে ডরাস, কেউ চিৎকার করলে ভয় পেয়ে যাস! তোর কীসের এত ভয় বল তো বোকা ছেলে!”

এইভাবে কেউ কারও কথা না বুঝেও তাদের মধ্যে দিব্যি গল্পসল্প হয়। রোজ।

“বুঝলি পাঁচু, আমার দাদাশ্বশুর সনাতন হাওলাদার মস্ত সিদ্ধাই। ওই পশ্চিমধারে পুকুরের ওপাশে তার আখড়া। তা ক’দিন হল সেখানে নাকি রাতে খুব ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। লোকজন সব দল বেঁধে দেখতে যাচ্ছে। আমরাও আজ যাব। তুই যাবি? তা হলে তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ভূত দেখেছিস কখনও? আমি ভাই দেখিনি। কিন্তু খুব ভয় পাই।”

পাঁচু জবাবে কী সব যেন বলে যায়। এরকম কথাবার্তা হতে-হতে একদিন মাধবী বলল, “হ্যা রে পাঁচু, আমার কাছে বাংলা শিখবি? তোর সঙ্গে কথা কয়ে যে সুখ হচ্ছে না! ভাবছি, কাল থেকে তোকে বাংলা বলা শেখানো শুরু করব।

পাঁচু হঠাৎ বলল, “জানি তো!”

মাধবী উর্ধ্বমুখ হয়ে একটা ভেজা শাড়ি মেলছিল। জবাব শুনে অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে পাঁচুকে বলল, "কে কইল রে কথাটা ?"

"আমি।"

মাধবী চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই। ওমা! তুই কী করে বাংলা শিখে গেলি?"

"শুনে শুনে।"

"এত অল্পদিনে। হ্যাঁ রে পাঁচু, তোর তো খুব বুদ্ধি। যাই, এক্ষুনি খবরটা সবাইকে বলে আসি।"

"না, কাউকে বোলো না। আমি কথা বলতে ভালবাসি না।"

"ওমা! কেন রে? আমি তো বাপু, কথা না বলে এক দণ্ড থাকতে পারি না।"

"তা হলে কি আমার সঙ্গেও আর কথা কইবি না ভাই?"

"শুধু তোমার সঙ্গে বলব। আর কারও সঙ্গে নয় কিন্তু।"

"ঠিক আছে, তাই হবে। এখন বল তো তোর পুরো নামটা কী?"

"আমার নাম কিন্তু পাঁচু নয়। পাউ চি ই।"

"ওমা! ও আবার কেমনধারা নাম? তুই কি চিনেম্যান নাকি?"

"না। এটা ঠিক নাম নয়। একটা সংখ্যা, একটা পরিচয়, একটা স্পন্দন।"

"ও বাবা! ওরকম শক্ত-শক্ত কথা বললে কি আমি বুঝতে পারি? সোজা করে বল না।" "

পা উ চি ই হল একটা সম্পূর্ণ পরিচয়। শুধু নাম নয়।"

"তা হ্যাঁ ভাই, তুই কি তামিল?"

"না। আমি একজন সাংখ্য। আমাদের চিহ্ন হল মাহা।"

"ও পাঁচু। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

পাঁচু হাসল। বলল, "ঠিক আছে। তোমার কাছে আমি শুধু পাঁচু।"

"বাঁচালি ভাই, কী সব বলছিলি, আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। হ্যাঁ রে, তোর বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে-কে আছে, বলবি না?"

"না। বললে তোমার মাথা আরও ঝিমঝিম করবে।"

"তা হলে থাক। তুই বোধ হয় আমাদের মতো নোস।"

"না। আমি তোমাদের মতো নই।"

"হ্যাঁ রে, তুই সব সময়ে অত ভয়ে-ভয়ে থাকিস কেন? তুই কি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস?"

"না। আমাকে যারা খুঁজছে, তারা পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।"

"ও বাবা! শুনেই যে আমার ভয় করছে। তা হলে কী হবে রে পাঁচু? তোকে ধরে নিয়ে যাবে?"

"ওইরকমই কিছু।"

"বডড হেঁয়ালিতে কথা বলিস তুই বুঝিয়ে বলবি তো!"

"তোমার দাদাশ্বশুরের আখড়ায় রাতে যা দেখা যায়, সেগুলো ভূত নয়।"

“তা হলে কী?”

ওটা হল এক ধরনের জাল। নম্বর, অঙ্ক, প্রতীক, চিহ্ন আর স্পন্দনের জাল। ওরকম জাল ওরা চারধারে ছড়িয়ে দিচ্ছে।”

“কীসের জাল বললি?”

“তুমি বুঝবে না। ওই অঙ্ক আর সঙ্কেত ছাড়া ওরা আমাকে খুঁজে পাবে না। শুধুমাত্র অঙ্কের ভিতর দিয়েই ওদের আমার নাগাল পেতে হবে। কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়।”

“আর বলিস না ভাই। আমি এবার অজ্ঞান হয়ে যাব।”

৫

নাঃ, সময়টা বড়ই খারাপ যাচ্ছে দুলালখ্যাপার। বিমর্ষ মুখে বসে প্রাতঃকালে চা খাচ্ছিলেন। সকালে দু’বার কড়া লিকার চা খাওয়ার অভ্যাস। আজ চার গেলাস হয়ে গিয়েছে, তবু মনের বিমর্ষ ভাবটা কাটছে না। আজ সকালেই বাউরি-বউ এসে পাড়ার জানান দিয়ে কী হেনস্থাটাই করে গেল, “বলি ও খ্যাপাঠাকুর, গত চোত মাসে কানের মাকড়ি বাধা দিয়ে আড়াইশো টাকা গচ্চা দিয়ে বলে গেলুম, ঠাকুর, আমার শাউড়ির ওলাউঠো হোক। তা কোথায় কী? শাউড়ির বদলে ওলাউঠো হল আমার খুড়শ্বশুরের। বলি, বাণটানগুলো একটু টিপ করে মারতে পার না? ভালয়-ভালয় টাকাগুলো ফেরত দিও বাপু, নইলে কুরুক্ষেত্র হবে।”

ন্যাপা উঠোন ঝ্যাঁটাচ্ছিল আর আড়ে-আড়ে দেখছিল। মুখে কি একটু খুশির হাসি? সকাল থেকেই ন্যাপা ঘ্যানঘান করছে, “ওঃ, কাল সনাতনবাবার আখড়ায় কী জিনিসই দেখে এলুম। চোখ সার্থক, জীবন সার্থক। চারদিক ভূতে-ভূতে ছয়লাপ। গোল ভূত, তেকোনা ভূত, লম্বা ভূত, বেঁটে ভূত। বাতাসে কিলিবিলি করে ভেসে বেড়াচ্ছে। আহা, সনাতন সিদ্ধাইয়ের মতো গুরু পেলে আর পায় কে।”

দুলালখ্যাপা এসব শুনে প্রমাদ গুনছেন। তার চেলা আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। যে চারজন ছিল, তাদের তিনজনই সনাতন হাওলাদারের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে। একা পড়ে আছে ন্যাপা। দুলালখ্যাপা দু-একবার বলেছেন, “ওরে গুরুত্যাগ করতে নেই। গুরুত্যাগ মহাপাপ।”

“আহা, ত্যাগের কথা উঠছে কেন। বলি, গত দু’বছর তো মাটি কামড়ে পড়ে আছি। এবার একটু বিভূতি-টিভূতি দেখান। সনাতন সিদ্ধাইয়ের সাধনপীঠে গিয়ে দেখে আসুন, সন্ধের পর যেমন কাতারে-কাতারে লোক ভিড় করছে।”

“ওরে ভূত দেখতে চাস? সে তো আমি এক লহমাতেই দেখাতে পারি। কিন্তু ওসব হচ্ছে নিচুস্তরের ব্যাপার।”

“সে তো বুঝলুম, কিন্তু একটু বিভূতি-টিভূতি না দেখালে যে মোটেই গা গরম হচ্ছে না মশাই!” এজন্যই সকাল থেকে মনটা বড় বিমর্ষ। চার নম্বর গেলাসের চা-

টা খেয়েও যেন মনটা চাগাড় দিয়ে উঠছে না।

ন্যাপা উঠোন ঝেঁটিয়ে কুটোকাটা সব জড়ো করতে-করতে বলল, "এই যে বাউরি-বউ সকালে এসে বলে গেল, আপনার বাণে কাজ হয় না, এতে তো আমাদেরও বেশ অপমান হচ্ছে মশাই!"

দুলালখ্যাপা মিটমিট করে চেয়ে বলেন, "কাজ হয় না কে বলল? শুনলি না বাণটা একটু হড়কে ওর খুড়শ্বশুরের উপর পড়েছে। তা বানের অমন একটু আধটু এদিক ওদিক হয়। বাণ বৃথা যায়নি রে, ক্রিয়া হয়েছে ঠিকই।"

"বৃন্দাবনবাবুর পিত্তশূলের জন্য যে মাদুলি আর জলপড়া দিলেন, তাতে তো কাজই হল না। তারা এখন বড় ডাক্তার দেখাচ্ছে।"

দুলাল বুঝতে পারছেন, ন্যাপাকে আর বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। নাঃ, এই ফটফটে দিনের আলোতেও দুলালখ্যাপা যেন চোরা অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন। ওই তো জাম গাছের মোটা ডাল থেকে মৌচাকের মতো অন্ধকার ঝুলে আছে। তা থেকে টুপটাপ করে ফোঁটা ফোঁটা অন্ধকার ঝরে পড়ছে নীচে। বটতলার ছায়ায় অন্ধকার দোলনায় দোল খাচ্ছে গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে গুড়ি মেরে, গা ঢাকা দিয়ে অন্ধকার যে এগিয়ে আসছে, তা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

দুলালখ্যাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু চোখ বুজলেন। তারপর চোখ খুলতেই দেখলেন, তার নাকের ডগায় বাতাসে কালো বিড়ালের লেজের মতো একটা প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে আছে। তাজ্জব হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। চোখের ভুলই হবে ভেবে হাত দিয়ে একটা ঝাপটাও মারলেন। কিন্তু চিহ্নটা একটু দোল খেয়ে ফের স্থির হল। দুলালখ্যাপা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ন্যাপা..."

হুট করে ভোজবাজির মতো বাতাস ফুড়ে একটা লোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। রোগাটে, লম্বা চেহারা, রুখু চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কোটরগত চোখ, গায়ে একটা ময়লা ডোরাকাটা পিরান আর পরনে লুঙ্গি। লোকটা খপ করে প্রশ্নচিহ্নটাকে ধরে তার কাঁধের ঝোলায় পুরে ফেলে এক গাল হেসে বলল, "কিনবেন নাকি বাবা?"

"কিনব! কী কিনব হে?"

"এই অন্ধকারের কথাই বলছিলাম। বডড খাটি আর সরেস জিনিস ছিল। একদম নিরেট, নিকষ্যি কালো, নিখুঁত অন্ধকার।"

"অন্ধকার। অন্ধকার কি বিকিকিনি হয়?"

"খুব হয়। বিপদে আপদে অন্ধকার খুব কাজে লেগে যায় বাবা। পাইকারি দরেই দিচ্ছি।"

স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছেন না। তাই ফের চোখ কচলে ভাল করে লোকটার দিকে তাকালেন। লোকটা দিব্যি জুলজুল করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

"অন্দকার দিয়ে কী হয়?"

"আজ্ঞে অনেক কিছু হয়। অন্ধকারে অনেক জিনিস লোপাট করে দেওয়া যায়। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়। গা ঢাকা দেওয়ারও ভারী সুবিধে হয়ে যায় বাবা। নমুনা হিসেবে আপনার ওই জাম গাছে অন্ধকারের একটা চাক লাগিয়ে রেখেছি বাবা। পরখ করে দেখবেন, খুব খাটি জিনিস। কোনও ভেজাল নেই।" বড় ঘাবড়ে গিয়েছেন দুলালখ্যাপা। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "ওরে বাবা রে! এসব কী শুনছি!"

লোকটা যেন ভরসা দিয়েই বলল, "ঘাবড়ানোর কিছু নেই বাবা। এখন যুদ্ধে নানারকম অস্ত্রের দরকার হয়। আগেকার মতো বন্দুক, বোমায় তেমন কাজ হয় না কিনা। আজকাল যুদ্ধে অন্ধকার খুব কাজের জিনিস।"

দুলালখ্যাপা আর থাকতে না পেরে আর্তস্বরে "ন্যাপা!" বলে প্রাণপণে চেঁচালেন। ন্যাপা পুকুরে গিয়েছিল। ডাক শুনে ছুটে এসে বলল, "কী হয়েছে বাবাঠাকুর ? সাপে কেটেছে নাকি?"

বিদ্যাধরপুরের বিখ্যাত জমিদার চৌধুরীদের সুদিন যে চুপি-চুপি, কাউকে কিছু না বলে, জানান না দিয়ে নীরবে বিদায় নিয়েছে এবং দুর্দিন যে দেতো হাসি হাসতে-হাসতে ফস করে ঢুকে দিব্যি গ্যাট হয়ে বসে পড়েছে এটা রাঘববাবু বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু পৃথিবীর নির্মম সত্যগুলো কোনও না কোনও সুযোগে ঠিকই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। সত্যটা রাঘববাবু টের পেলেন যখন বছর দুই আগে একদিন দুপুরবেলা তার হঠাৎ খিদে পেল। খিদে জিনিসটার সঙ্গে তার কোনও পূর্বপরিচয় ছিল না। খিদে আসলে কী ও কেমন তাও জানতেন না তিনি। তাই খুবই বিস্মিত হলেন এবং ভয় পেয়ে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার বৈদ্যনাথ বিশ্বাস এসে ভাল করে পরীক্ষা করার পর রায় দিলেন, "এটা খিদের লক্ষণ।" শুনে রাঘববাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তার যে কোনওদিন খিদে পেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। চৌধুরীবাড়ির পুরুষদের খিদে বলে কোনও বস্তুই কখনও ছিল না। ঘুম থেকে উঠতেই রুপোর গেলাসে গরম দুধ, দুধের পিছু-পিছু আসত লুচি আর মোহনভোগ, একটু দম নিতে না-নিতেই এক থালা ফল, সেটা ভাল করে তল হওয়ার আগেই ষোলোটা বাটিতে ঘেরা থালায় মিহি চালের গরম ভাত। এভাবেই ঘণ্টায়-ঘণ্টায় তারা খেতেন। ভরা পেটেই খেতে হত তাদের। খেয়েই যেতে হত। যতক্ষণ না রাতে ঘুমিয়ে পড়ছেন। তাই যেদিন রাঘববাবুর খিদে পেল, সেদিনই তিনি বুঝতে পারলেন, চৌধুরীদের সুদিন আর নেই।

একশো বাষট্টি জোড়া জুতো ছিল রাঘববাবুর। এখন তিন জোড়ায় এসে ঠেকেছে। তার মধ্যে এক জোড়া আবার হাওয়াই চটি। পাঞ্জাবিটিতে সোনার বদলে প্লাস্টিকের বোতাম। জুড়িগাড়ির জায়গায় সাইকেল।

সকাল থেকেই আজ মনটা খারাপ। গদাধর লিগে গতকালও বিদ্যাধরপুর ফরাসগঞ্জের কাছে দু' গোলে হেরেছে। কাল বাজার থেকে যে তরমুজটা এনেছিলেন, আজ সকালে সেটা কাটতে গিয়ে দেখা গিয়েছে সেটা পচে গোবর।

খালধারের জমিটা নিয়ে নন্দ সাহার সঙ্গে যে মামলা চলছিল, গতকাল তার রায় বেরিয়েছে। রাঘববাবু হেরে গিয়েছেন।

ঠাকুরদা বিষ্ণুপ্রতাপ গুণের সমঝদার ছিলেন খুব। তিনি বিদ্যাধরপুরের গৌরববৃদ্ধির জন্য কুস্তিগির রামু পালোয়ান, ওস্তাদ কালোয়াত নরেন গোঁসাই আর জাদুকর পঞ্চানন গুইকে এখানে এনে বসত করিয়েছিলেন। নিষ্কর জমি দেওয়া হয়েছিল, মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। গতকালই রামু পালোয়ান দেখা করতে এসেছিল। ভাঙাচোরা দড়ি পাকানো চেহারা। বহুকাল মাসোহারা বন্ধ বলে কত কষ্টে আছে, সেই সবই দুঃখ করে বলছিল। কয়েকদিন আগে পঞ্চানন গুইকে দেখতে গিয়েছিলেন রাঘব। শয্যাশায়ী। বাড়িতে হাড়ির হাল। আর আজ সকালে নরেন গোঁসাই নাতির হাত ধরে লাঠিতে ভর করে এসে বাজার খরচের জন্য কুড়িটা টাকা একরকম ভিক্ষে নিয়ে গেল।

সকাল থেকে তাই মনটা বড় খারাপ রাঘববাবু রুটি আর কুমড়োর ঘ্যাঁটের জলখাবারটা পর্যন্ত স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়নি। জঙ্গল আর আগাছা ভরা বাগানে এসে ভাঙা ফোয়ারার ধারে বাধানো চাতালে পিপুল গাছের ছায়ায় বসে আছেন। মাঝে-মাঝে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে। চোখেও ভিজে-ভিজে ভাব। একটু কাঁদতে পারলে বোধ হয় বুকটা হালকা হত। কিন্তু পুরুষসিংহের তো কাঁদতে নেই! অনেক দূর থেকে একটা মাটির বেহালার আওয়াজ আসছিল। ভারী মিঠে আওয়াজ। ছেলেবেলায় বিস্তর শুনেছেন এই আওয়াজ। কিন্তু বেহালা কিনে বাজাতে গিয়ে দেখেছেন ফেরিওয়ালার মতো হয় না। আজকের আওয়াজটা শুনে ভারী ভাল লাগছিল।

বাজনদার ফেরিওয়ালাটা আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছিল। তারপর বাড়ির সামনেই এসে বাজাতে লাগল। কান পেতে শুনছিলেন রাঘববাবু। বড্ড ভাল বাজায় তো! মাটির বেহালায় এত সুন্দর আওয়াজ হয়, এ তার জানাই ছিল না। মনটা আস্তে-আস্তে ভাল হয়ে যাচ্ছিল। চোখ বুজে বিভোর হয়ে বেহালার সুর শুনতে-শুনতে বোধ হয় বাহ্যজ্ঞান ছিল না। হঠাৎ খুব কাছ থেকে কে যেন বলল, "বেহালা নেবেন নাকি বাবু?" চোখ চেয়ে দেখেন সামনে বুড়ো মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে। পরনে একটা ময়লা চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে খয়েরি রঙের ফতুয়া, রুখু দাড়ি আর বাকড়া চুল। রাঘববাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না হে বাপু, বেহালা দিয়ে আমি কী করব? তবে তুমি বড় ভাল বাজাও।" "বেহালা একটা রেখে দিন বাবু, কোন সময় কোন কাজে লেগে যায় তার ঠিক কী?"

"ও বেহালা তোমার হাতে যেমন বাজে, আমার হাতে তো তেমন বাজবে না আমি জানি। আমার কোন কাজে লাগবে?"

"শব্দ বড় কাজের জিনিস বাবু শব্দ দিয়ে কত কী হয়, সে ভেবে শেষ করা যায় না। শব্দে প্রলয় ডেকে আনা যায়, শব্দ দিয়ে প্রলয়কে ঠেকানোও যায়। কত হারানো জন, কত হারানো জিনিসের সন্ধান বয়ে আনে শব্দ। কত বিপদআপদে শব্দ এসে রক্ষা করে। ঠিকঠাক শব্দ হল বীজমন্ত্রর মতো।"

রাঘববাবু অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি?"

গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে এক ঝিলিক হেসে লোকটা বলে, "আমি পাগল নই বাবা, প্রলাপ বকছি না। এই বেহালা বাজিয়ে আমিও তো একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ভ্রূ কুঁচকে রাঘব বলেন, "সে আবার কেমন খোঁজা হে?"

"কী করি বাবা, শব্দ ছাড়া যে কিছুতেই তার নাগাল পাওয়ার উপায় নেই। কত কিছু আড়াল করে রেখেছে তাকে। কত হিসেবনিকেশ কত স্পন্দন, কত গন্ধ, কত রূপের আবডালে সে লুকিয়ে রয়েছে। শব্দের রশি ধরে-ধরে তার কাছে এগোতে হয়।"

রাঘববাবুর সন্দেহ হল, লোকটার মাথার দোষ। বললেন, "কাকে খুঁজছ বাপুঃ তোমার নাতিপুতি নাকি?"

"আজ্ঞে ওই রকমই। খবর পেয়েছি, তার বড় বিপদ।"

"বাপু হে, বেহালা বাজিয়ে তাকে খোঁজার চেয়ে পুলিশের কাছে যাও না কেন?"

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বলল, "বেহালাটা রেখে দিন বাবু, কাজে লাগবে।"

"রেখে কী লাভ বলো? বাজাবে কে?"

"যেদিন দরকার হবে, সেদিন বেহালা আপনিই বাজবে।"

"ধুর পাগল! বেহালা নিজে কখনও বাজে?"

লোকটা ফের তার ঝিলিক দেওয়া হাসিটা হেসে বলল, "বড় ঠিক কথা বাবু। বেহালা, বীণা, বাঁশি কেউই বাজনদার ছাড়া বাজে না। বাদ্যযন্ত্র নিজের আওয়াজ শুনতে পায় না। রসও পায় না। কিন্তু এই বেহালাটা তেমন নয়। এর ভিতরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আছে। এ চারিদিকটাকে টের পায়, যখন সময় হবে, তখন দেখবেন বেহালা কেমন আপনা-আপনি মোহনসুরে বেজে উঠবে।"

রাঘববাবু হাসলেন। পাগল আর কাকে বলে, তবে তর্ক তুললেন না। বললেন, "তুমি গুণী মানুষ। তোমাকে বরং দশটা টাকা নজরানা দিচ্ছি। ও বেহালা আমি কিনব না বাপু।"

"আজ্ঞে কিনতে হবে না। যন্ত্র ঘরে রেখে দিলেই হবে। আমি কাঙাল ফকির মানুষ বটে, তবে আমি নজরানা নিই না।"

লোকটা একরকম জোর করেই বেহালাটা তাকে গছিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। রাঘববাবু বেহালাটা ভাল করে দেখলেন। মাটির বেহালা যেমনটা হয়, তেমনটাই। কোনও আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। তবে জিনিসটা অনেকদিনের পুরনো বলে মনে হচ্ছে।

বেহালাটা কোলে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ বাগানে বসে রইলেন রাঘববাবু। সকাল থেকে মনটা বড় ভার হয়ে ছিল। পাগল বাজনাদারটা এসে এমন ভাল বাজনা শোনাল যে, এখন আর মনের ভার একটুও নেই। বরং ভারী ফুরফুরে লাগছে। বেহালাটার গায়ে একটু ভালবাসার হাত বুলিয়ে আদর করলেন রাঘব।

গোলোকবিহারীর বাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ, বাক্স-টাক্সও গোছানো হয়ে গিয়েছে। আগামীকালই গোলোকবাবু বাঁকুড়ার এক গ্রামে তার পিসির বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। এই গুপ্তিপাড়ায় আর কোনওদিন ফিরে আসবেন কিনা তা পরে ভাববেন, আপাতত স্থানত্যাগ না করলে তার সমূহ বিপদ গাঁয়ের মাতব্বররা এসে হাতেপায়ে ধরে তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছেন। ছাত্ররা এসে কান্নাকাটি করেছে। মনসারাম দু'বেলা এসে তাকে পইপই করে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু গোলোকবিহারী কারও কথাই শুনতে রাজি নন। আজও সকালে তিনি টেবিলে এক তা কাগজ পেয়েছেন, তাতে ফের নতুন একটা ইকোয়েশন। রাতবিরেতে যখন তখন সেই পাদ্রিসাহেব এসে হাজির হচ্ছেন। স্বপ্ন না মতিভ্রম না ভূত দেখছেন, তা বলতে পারবেন না গোলোকবাবু। তবে তার খাওয়া কমে গিয়েছে। ঘুম হচ্ছে না। পেটে বায়ু, গলায় অম্বল আর বুকে ধড়ফড়ানি এত বেড়েছে যে, যে-কোনও সময় হার্টফেল হয়ে যাবে! ডাক্তার বলেছে তার প্রেশারও খুব বেশি, গুপ্তিপাড়া না ছাড়লে তার প্রাণসংশয়, আর প্রাণে যদি বেঁচেও থাকেন, তা হলেও পাগল হয়ে যাবেন। হতে আর বিশেষ বাকিও নেই।

মনসাপণ্ডিত আজ সকালে এসেও তাঁকে বুঝিয়েছেন,"তুমি অঙ্কের লোক হয়েও কি আজগুবিতে বিশ্বাস কর? যা কিছু হচ্ছে তা তোমারই মনের প্রোজেকশন, অঙ্ক নিয়ে বড্ড বেশি মজে থাক বলে ওরকম হতেই পারে। দু দিন

অঙ্ক থেকে ছুটি নিয়ে একটু ঘুরেটুরে এসো, ঠিক আছে। তা বলে গুপ্তিপাড়া চিরতরে ত্যাগ করবে কেন?"

গোলোকবাবু অত্যন্ত তেতো মুখে বললেন, "গুপ্তিপাড়া অত্যন্ত খারাপ জায়গা।"

"বলো কী হে! গুপ্তিপাড়ার গৌরবের দিকটা কি ভুলে গেলে? এখানকার মাটিতেই মন্তাজ আলি আঠেরো কেজি ওজনের কুমড়ো ফলিয়েছিল। এ গাঁয়ের হরেকৃষ্ণ সরখেল সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করেছিল। এই গুপ্তিপাড়ার বলাই ময়রার খাজা যে বিলেত আমেরিকাতেও চালান যায়।"

"তুমি তোমার গুপ্তিপাড়ার গৌরব নিয়েই থাকো ভাই। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছি না।"

গোলোকবাবুর গোঁ দেখে মনসারাম পিছু হটলেন।

কাল সকালেই ভ্যানগাড়ি এসে পড়বে। ট্রেনের টিকিটও কেটে রেখেছেন গোলোকবাবু। সকালে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ারই যা অপেক্ষা। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে গোলোকবাবু একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন খুব ভিরু গলায় ডাকল, "গোলোকস্যার কি আছেন? গোলোকস্যার!"

গোলোকবাবু উঠে দরজা খুলে দেখেন একটি কুড়ি-একুশ বছর বয়সি ছেলে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বই।

"কী চাও বাপু? অঙ্ক বুঝতে এসেছ নাকি? ও আমি পারব না।"

"না স্যার, অঙ্ক বুঝতে নয়। আপনি তো চলে যাচ্ছেন, তাই আপনাকে একটা প্রণাম করতে এলাম।"

"তুমি কি এই গাঁয়ের ছেলে? তোমায় তো চিনতে পারছি না!"

"না স্যার, আমি এ গাঁয়ের ছেলে নই, তবে আপনাকে চিনি।"

"কীভাবে চেন?"

"তা আপনার অঙ্কের ভিতর দিয়েই চিনি।"

"সে আবার কেমন কথা?"

ছেলেটা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। কাচুমাচু মুখ করে বলল, "আমার বাবা অঙ্কের পণ্ডিত ছিলেন তো, তার কাছে শুনেছি আপনার কথা।"

"ও, বুঝলাম, আর কিছু বলবে?"

"আমার বাবার কালেকশনে অনেক অঙ্কের বই ছিল, কিন্তু আমরা কেউ অঙ্ক বিশারদ হইনি। বইগুলো পড়ে-পড়ে নষ্ট হচ্ছে। বাবা অনেক কষ্টে সব সংগ্রহ করেছিলেন। সেইসব বই থেকে একটা বই আপনাকে বিদায়ী উপহার হিসেবে দিতে এসেছি। দয়া করে যদি নেন!"

"না বাপু, অঙ্কে আমার আর আগ্রহ নেই।"

"রেখে দিন না স্যার। না পড়লেও চলবে। কখনও ইচ্ছে হলে একটু উলটেপালটে দেখবেন। রেয়ার বই স্যার।"

গোলোকবাবু ঘোর অনিচ্ছে সত্ত্বেও বইটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "কষ্ট করে যখন এনেছ তখন দাও। রেখে দিই।"

ছেলেটা ভারী খুশি হয়ে তাকে প্রণাম করে চলে গেল। গোলোকবাবু দরজা বন্ধ করে আড়চোখে বইটা একবার দেখলেন। কুচকুচে কালো মলাটের উপর সোনালি অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা। এ গাইড টু মেগা ম্যাথমেটিক্স। বই হাতে পেলেই মানুষের স্বভাব হল পৃষ্ঠা উলটে একটু দেখা। গোলোকবাবুও দেখলেন। আর দেখেই তার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু নানা রকম অচেনা দুর্বোধ্য চিহ্ন। প্রায় কোনও চিহ্নই সংখ্যার দ্যোতক নয়। তা হলে এগুলো কী? ঘুম মাথায় উঠে গেল। তিনি বইটা খুলে নিবিষ্টভাবে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। মনে হল, এগুলো আসলে অঙ্কই, তবে অচেনা কোনও পদ্ধতি বা ভাষায় লেখা। এ বই কোন কাজে লাগবে?

হঠাৎ দেখতে পেলেন, মোটা বইটার একটা পাতার ফাঁকে একটা চিরকুট গোঁজা রয়েছে। চিরকুটটা একটা সাদা, লম্বা প্লাস্টিকের মতো জিনিস। প্লাস্টিকের টুকরোটা তুলে আলোয় ধরতেই দেখতে পেলেন, সংখ্যাগুলিকে চেনার সংকেত দেওয়া আছে। গোলোকবাবু তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম নিয়ে বসে খোলা পৃষ্ঠা থেকে একটা অঙ্ক টুকে তাকে চেনা সংখ্যায় নিয়ে এলেন। কাল্পনিক সংখ্যা যেমন, এক্স, ওয়াই, জেড চিনে নিতেও তেমন কিছু অসুবিধে হল না। কিন্তু ছেলেটা এই অদ্ভুত বইটা তাঁকে দিয়ে গেল কেন, তা গোলোকবাবুর বোধগম্য হল না। গোলোকবাবু কী ভেবে বইটা প্রকাশ্যে রাখলেন না। বিছানায় তোশকের নীচে গুজে রেখে দিলেন। চট করে যাতে কারও চোখে না পড়ে। রাতে খেয়েদেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনেই শুতে গেলেন গোলোকবাবু। একটা রাত মোটে। সকালেই এই গন্ডগোলের জায়গা ছেড়ে পগারপার হবেন বলে মনটা ভালই লাগছিল তার। রাতটা ভালয়ভালয় কাটলে হয়।

কিন্তু কাটল না। পয়লা প্রগরে শেয়ালের ডাক শেষ হতে না-হতেই গোলোকবাবুর ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড শীতে। শরৎকাল, এরকম ঠান্ডা পড়ার কথা নয়। ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে দেখলেন তিনি শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রয়েছেন, ঠিক আগের মতোই। সামনে টেবিলের মতো কিছু ওপাশে সেই প্রকাণ্ড সাহেব। সাহেব তার তীব্র নীল দুই চোখে গোলোকবাবুকে যেন ছ্যাদা করে দিচ্ছিল। সম্পূর্ণ অচেনা এক ভাষায় সাহেব কিছু একটা বলল। আশ্চর্যের বিষয় গোলোকবাবু ভাষাটা বুঝলেন না। কিন্তু অর্থটা পরিষ্কার বুঝলেন। সাহেব বলছে, "তুমি কি অঙ্কের হাত থেকে পালাতে চাও?'

"হ্যাঁ সাহেব, আমি অঙ্ক সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, ক্লান্ত। আমি রেহাই চাই।"

"অঙ্ক তুমি আর কতটুকু জান? ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে দাখো, ওই মহাশূন্য, ওই নক্ষত্রমণ্ডলী ওই সব কিছুই চলেছে অঙ্কের নিয়মে। প্রকৃতির ভিতরে চলেছে এক অন্তহীন জটিল অঙ্কের স্রোত। অঙ্ক ছাড়া কিছুই হয় না। এই যে তুমি জন্মেছ, একটা কেঁচো, একটা ব্যাঙ, একটা জীবাণু, একটা ইঁদুর যে জন্মায়, তার

পিছনেও রয়েছে অন্তহীন হিসেবনিকেশ। বিশ্বজগতে আকস্মিক বলে কিছু নেই। আজ যে ফুলটা ফুটল, তাদের যে অঙ্কুর বেরোল, ভেবে দ্যাখো, তাও সম্ভব হচ্ছে নানা জটিল হিসেবনিকেশের ফলে। কোন উপাদান কতটা সন্নিবেশিত হলে একটা টিকটিকির জন্ম হয়, সেটাও কি অঙ্কেরই বিষয় নয়? এই যে বিশাল বটগাছ, তার ছোট্ট বীজটির মধ্যে পোরা থাকে তার প্রোগ্রাম। অঙ্ক ছাড়া কি তা সম্ভব? গোলাপফুল তোমার ভাল লাগে না? পাপড়ি মেলে যখন ফোটে, সুগন্ধ ছড়ায়, সে কি এমনি? ওই গোলাপ ফোটানোর জন্য কত হিসেবনিকেশ রয়েছে তা কি জানো? তুমি তো সামান্য অঙ্কবিদ। আমি তোমাকে যেসব অঙ্ক কষতে দিয়েছি, তা আমাদের অঙ্কশাস্ত্রের ধারেকাছেও নয়। ওগুলো সহায়ক অঙ্কমাত্র। আমরা যে সব অঙ্কের ভিতর দিয়ে আমাদের পথ তৈরি করছি, তা বোঝার সাধ্যও তোমার নেই। তুমি মুখ, তাই জান না, অঙ্কের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।''

''ঠিক কথা, আমি সামান্যই অঙ্ক জানি। কিন্তু আপনি আমাকে দিয়ে অঙ্ক কষাচ্ছেন কেন?''

''আমরা একজনের সন্ধান করছি তুমি জান, সে অপরাধী এবং ফেরারি। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তুমি আমাদের সেই কাজে সাহায্য করছ।''

''সে কোথায় আছে?''

''আমাদের অনুমান কুড়ি মাইল বৃত্তের মধ্যেই সে রয়েছে।''

''সে কি আমাদের মতোই মানুষ?''

''হ্যাঁ এবং না, সে একজন শরীরী কিন্তু সংকেতময়।''

''তার মানে কী?''

''এটা বোঝার মতো মস্তিষ্কবান মানুষ তুমি নও, শুধু এটুকু জেনে রাখো, সেও একটা সূক্ষ্ম জটিল অঙ্কের ফলিত রূপ। তার কাছে পৌছতে গেলে আমাদেরও অনেক জটিল সংকেতময় পথ ধরে যেতে হবে। তাকে চোখে দেখে চেনা সম্ভব নয় কারণ, নিজের চেহারা সে অনায়াসে বদল করতে পারে।''

''শরীর মনের অনুগামী হলে অনায়াসে সম্ভব। এই যে আমি তোমার সামনে বসে আছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ? আবার আমি যে হঠাৎ নেই হয়ে যাই, সেটা কীভাবে সম্ভব?''

''আপনার কি রক্তমাংসের শরীর আছে?''

''ঠিক রক্তমাংসের নয়, অন্য উপাদান, অনেক উন্নত উপাদান।''

''আমি কি স্বপ্ন দেখছি?''

''না, স্বপ্ন দেখছ না।''

''*তা হলে এটা কি বাস্তব?''

''ঠিক বাস্তবও নয়, বলতে পার কাল্পনিক সত্য।''

''হিপনোটিজম নয় তো!''

''না, হিপনোটিজম হলে তুমি প্রশ্ন করতে না, শুধু আদেশ পালন করতে।"

''আমি কি আপনার হাতের ক্রীড়ানক?''

"প্রকৃতির নিয়মেই শক্তিমানরা আধিপত্য করে।"

"আমার কাছে আপনি আর কী চান?"

"তোমার সাহায্যে আমরা তার কাছে পৌছতে চাই। তোমাদের গ্রহবাসীদের একটা ঠিকানা থাকে, চেহারার বৈশিষ্ট থাকে, পরিচয় থাকে, তাদের চিহ্নিত করা বা খুঁজে পাওয়া সহজ। কিন্তু যারা মহাকাশে বিচরণ করে তাদের ঠিকানা নেই, চেহারা নেই, শুধু সংকেত আছে। ওই সংকেত ভেদ করার জন্য আমাদের তোমাকে দরকার। সব কিছু নির্ভর করছে অঙ্কের ফলাফলের উপর।"

"যদি তাকে পাওয়া না যায়?"

"সে ভয়াবহ পরিণতি যেন তোমাকে দেখতে না হয়।"

"সব যুদ্ধেরই কিছু আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি আছে।"

"হ্যাঁ, তাই অঙ্কটা খুব জরুরি, আমরা সেই ফেরারিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলেই তোমার ছুটি। তোমার পালানোর কোনও পথ নেই, মনে রেখো।"

ফের যেন চটকা ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন গোলোকবিহারী। ঢকঢক করে জল খেলেন। তারপর বিস্ফারিত চোখে অন্ধকার ঘরের দিকে চেয়ে রইলেন। সকালে যখন ভ্যানওয়ালা স্টেশনে জিনিসপত্র পৌছে দিতে এল, তখন গোলোকবিহারী নিবিষ্ট ভাবে তার চেয়ার টেবিলে অঙ্ক কষছেন। বিভোর অবস্থা, বাহ্যজ্ঞান নেই। স্ত্রী এসে বললেন, "কী গো, আজ যে আমরা রওনা হব। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

গোলোকবিহারী অবাক চোখ তুলে বললেন, "কোথায় যাব?"

"বাঁকুড়ায় যেতে হবে না!"

"বাঁকুড়া! বাঁকুড়াটা আবার কোথায়?"

স্ত্রী মৃন্ময়ী গোলোকবিহারীকে হাড়ে-হাড়ে চেনেন। এই লক্ষণও তার অজানা নয়। তিনি ভ্যানওয়ালাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। তারপর বাক্সপ্যাটরা খুলে গোছানো জিনিস বের করতে লাগলেন।

৬

"ঠাকুরমশাই কি জাগ্রত অবস্থায় আছেন?"

"আছি হে।"

"এই একটু পেন্নাম জানাতে এলাম।"

"দেবদ্বিজে তো অচলা ভক্তি দেখছি হে বেচারাম।"

"আজ্ঞে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের আর সম্বল কী বলুন!"

"দিনকাল পালটে গিয়েছে হে বেচারাম। বামুনের আর সেই মহিমাও নেই, কদরও নেই, বুঝলে?"

“যে আজ্ঞে, বড় মোক্ষম কথা বলেছেন ঠাকুরমশাই। তাই বসে-বসে ভাবি, চালডালের দাম বাড়ল, তেল মশলার দাম বাড়ল, পটল বেগুনের দাম বাড়ল, শুধু বামুনের দামটাই কেন পড়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারি না। লক্ষণটা কি ভাল বুঝছেন পণ্ডিতমশাই?”

“যুগধর্ম কি আর অস্বীকার করা যায় হে?”

“আপনারা উচ্চকোটির মানুষ, উঁচু থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান। আমরা নীচে থেকে বুঝছি, গতিক বড় সুবিধের নয়। ব্রাহ্মণের মহিমা না থাকলে যে বড় অরাজক অবস্থা হবে, পণ্ডিতমশাই।”

“তা আর কী করা যাবে বলো?”

“তা পণ্ডিতমশাই...”

“বলো।”

“উঁচু থেকে অবস্থাটা কেমন বুঝছেন? যুদ্ধটুদ্ধ লাগবে বলে কি মনে হয়?” .

“যুদ্ধ? না হে বাপু, যুদ্ধটুদ্ধর খবর জানি না। পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি।”

“সে তো বটেই। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ঠাকুরমশাই?”

“বলে ফেলো।”

“আগেকার দিনে ঢাল-তরোয়াল আর তির-ধনুকে যুদ্ধ হত, ঠিক কিনা? তারপর বোমা-বন্দুক এল। ঠিক বলছি তো?”

“ঠিকই বলছ হে।”

“তা এখন যুদ্ধ লাগলে আস্তর কী হবে ঠাকুরমশাই?”

“কেন হে বাপু, বোমা-বন্দুক কি সেকেলে হয়ে গিয়েছে?”

“আজ্ঞে জানতে চাইছিলাম, বোমা-বন্দুক ছাড়া মানুষ আর কোন অস্ত্র বের করেনি?”

“আর কোনও অস্ত্রের খবর তো জানি না বাপু।”

“এই যেমন ধরুন, অঙ্ক দিয়ে যদি যুদ্ধ হয়?”

“দুর! তাই কখনও হয় নাকি?”

“তা হলে বোধ হয় ভুলই শুনেছি আজ্ঞে।”

“কার কাছে কী শুনেছ, সেটা বলবে তো।”

“ওই মাথা পাগলা গোলোকবাবু, তার সঙ্গেই কাল বাজারে দেখা। দেখলুম ভারী ব্যস্ত। তাড়াহুড়ো করে কানা বেগুন, পচা আলু কিনে থলিতে ভরছে। তাই গিয়ে বললুম, “মাস্টারমশাই অত হুড়োহুড়ি করে বাজার করতে নেই। উনি খাপ্পা হয়ে বললেন, “আমার কি সময় আছে? এখনই গিয়ে অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে। নইলে যুদ্ধ লেগে যাবে যে!”

“বলল বুঝি?”

“যে আজ্ঞে। তারপর বললেন, যুদ্ধটা হবে নাকি অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের ”

“নাঃ, গোলোকের মাথাটাই গিয়েছে দেখছি।”

"তা ঠাকুরমশাই, অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের যুদ্ধ লাগলে কি আমাদের ভয়ের কিছু আছে?"

"অমন বিটকেল যুদ্ধের কথা জীবনে শুনিনি বাপু ভয়ের বদলে তো হাসি পাওয়ার কথা।"

"বাঁচালেন ঠাকুরমশাই। যুদ্ধর কথা শুনে বড় ভয় ধরেছিল। রাজায়রাজায় যুদ্ধ হয় আর প্রাণসংশয় হয় উলুখাগড়ার, কী বলেন?"

"তা তো ঠিকই। তবে যেদিন আমাদের গন্ধ-গজাল গিরীশ বাপুলি বাতাস শুকে বলেছিল যে, সে নাকি চারিদিকে যুদ্ধ-যুদ্ধ গন্ধ পাচ্ছে।"

"সে আবার কে হে?"

"আজ্ঞে, কানুনগোদের গুদোমঘরের পাহারাদার।"

"তা তাঁর অমন বিটকেল নাম কেন?"

"বাতাস শুকে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন কিনা! গন্ধ-গজাল বলে ডাকে। তা বলতে নেই, গিরীশ বাপুলি গন্ধও পায় বটে। বটেশ্বরের বাড়িতে শনিপূজোর নেমন্তন্নে গিয়ে বলল,'ওরে বড্ড পুরনো ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি, উঠোনের এই জায়গাটা খুঁড়ে দেখিস তো।' তা সত্যি উঠোন খুঁড়ে তিনহাত মাটির তলা থেকে একটা মেটে কলসি পাওয়া গেল। তাতে প্রায় একশো বছরের পুরনো ঘি। বটেশ্বর সেই ঘি কোবরেজমশাইকে সাতশো টাকায় বিক্রি করে কয়েকদিন খুব বাবুগিরি করল। এই গত চৈত্রমাসের ঠা-ঠা রোদ্দুরে এক দুপুরবেলায় গিরীশ বলল, 'ওরে বাবা, বড্ড ঝড়-তুফানের গন্ধ পাচ্ছি যে। আজ না প্রলয়কাণ্ড হয়ে যায়। তা হলও ঠাকুরমশাই, ঝড়-জলে একেবারে লন্ডভন্ড কাণ্ড। এই তো সেদিন বলাই ময়রার মিষ্টির দোকানে জিলিপি খেতে গিয়ে গিরীশ বাপুলি বলল, ওহে, এখানটায় কি একটু আগে নবকৃষ্ণ খেয়ে গিয়েছে?' বড্ড গুণি মানুষ আজ্ঞে। তবে আপনি যখন বলছেন, যুদ্ধ হবে না, তখন আর গিরীশ বাপুলির কথাটা ধরছি না। তা হলে আমি আসব?"

"এসো গিয়ে।"

আজ রাত্তিরে সনাতন সিদ্ধাইয়ের বড় বিপদ হল। সন্ধে পেরতেই চারদিকটা এমন বিদঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল যে সনাতন হা। যে ভূতুড়ে নকশাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেগুলো কে যেন আলকাতরায় চোবানো ন্যাকড়া দিয়ে লেপেপুছে দিয়েছে। তার চেয়েও বিপদ হয়েছে, দেশলাই জ্বলছে না। হ্যারিকেন ধরানো যাচ্ছে না, ধরালেই নিভে যাচ্ছে। কালী আর বটু দু'জনেই আলো জ্বালাবার জন্য বিস্তর মেহনত করে জাল ছেড়ে দিয়েছে। শেষে কালী বলেই ফেলল, "বাবাঠাকুর, আজ কি নতুন লীলার খেল দেখাবেন? আজ যে জোনাকি পোকারাও জ্বলছে না, বাবাঠাকুর। আমরা তিনজনেই একসঙ্গে কানা হয়ে যাইনি তো?"

সনাতনের সেই ভয়টাও হয়েছিল একবার। একটু-আধটু ফাঁকফোকর থাকেই। আজকের মতো এমন নিরেট আর জম্পেশ অন্ধকার তিনি জীবনে

দ্যাখেননি। ব
টু বলল, "বাবাঠাকুর, সন্ধের মুখেই আমি একটা হাড়গিলে চেহারার লোককে ঝোলা কাঁধে আসতে দেখেছি। চারদিকে খুব ঠাহর করে কী যেন দেখছিল। তারপর ওই বটগাছতলায় ঝোলা থেকে কী যেন একটা বের করে ছেড়ে দিয়ে গেল।"

"আজ্ঞে, তখন আমি হ্যারিকেনের সলতেটা সমান করে কাটছিলাম।

তাই ভাল করে দেখিনি। তবে আড়চোখে দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা কালো বিড়ালকে ছেড়ে দিয়ে গেল জঙ্গলে।"

"দুর বোকা! কালো বিড়াল ছাড়ল তো কী হল? বিড়ালের সঙ্গে অন্ধকারের সম্পর্ক কী?"

জবাবটা বটুর কাছ থেকে এল না। অন্যদিক থেকে এল। সনাতনের বাঁ ধারে খুব কাছ থেকে কে যেন একজন চাপা গলায় বলল, "কালো বিড়াল বড় সামান্য জিনিস নয় বাবাঠাকুর। সব আলো চেটেপুটে খেয়ে নিতে পারে।"

সনাতন ভড়কে গিয়ে বললেন, "কে রে?"

"আমাকে চিনবেন না। তা অন্ধকারটা কেমন লাগছে বাবাঠাকুর? বেশ নিকষ্যি অন্ধকার, না?"

সনাতন কেঁপেঝেঁপে মরেন আর কী ! কোনওরকমে বললেন, "এ যে বড্ড অন্ধকার""

"বটেই তো। ওই যে পাজি অঙ্কগুলো চারদিক ঘিরে ফেলেছে, সেগুলো লেপেপুছে গিয়েছে। যদি অন্ধকারের দরকার হয় তো বলবেন। যত চাই, দেব। অন্ধকার দিয়ে কত কাজ হয়, মশাই।"

"কীসের কাজ?"

"বাবাঠাকুর, কাজের কি শেষ আছে? অনেক কাজেই অন্ধকারেরও দরকার হয়। অন্ধকার একটা ভারী ভাল অস্ত্র।"

"তুমি সত্যিকারের কে বলো তো বাপু!"

"একজন ফেরিওয়ালা বললে কি বুঝতে পারবেন?"

"কীসের ফেরিওয়ালা বাপু তুমি?"

"তার কি কিছু ঠিক আছে মশাই? যখন যা পাই, তাই ফেরি করে বেচি। এখন অন্ধকার ফেরি করছি।"

"তা বাপু, আমার ভূতগুলো কোথায় গেল?"

"ওসব আপনার ভূত নয়, বাবাঠাকুর ও একটা ফাঁদ।"

"এই ফাঁদ হল একটা বেড়াজালের মতো জিনিস। গোটা তল্লাট ছেকে রুই-কাতলা-পুটি-খলসে সব তুলবে।"

"আমি যে বুঝতে পারছি না বাপু!"

"অত বুঝবার দরকার কী আপনার? যত বুঝবেন, তত সমস্যা বাড়বে। জপতপ নিয়ে থাকুন না চোখ-কান বুজে।"

“কিন্তু আমার যে ভয় করছে!”

“ভয় পাওয়া খুব ভাল মশাই ভয় দেখানোর জন্যই তো মশাই কাজকারবার লাটে তুলে এই এত দুর ছুটে আসতে হয়েছে।”

“বলো কী বাপুঃ শুধু আমাকে ভয় দেখাতে ছুটে এসেছ? তাতে কী লাভ?”

“দু মশাই! আমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে যে, আপনার মতো একজন জ্যান্তেমরাকে ভয় দেখানোর জন্য এত মেহনত আর সময় খরচ করব? যাকে ভয় দেখাতে আসা, সে বেশ শক্তপোক্ত আর মজবুত লোক মশাই। তাকে ভয় খাওয়ানো সহজ কাজ নয়।”

“সে কি আমার সাধনপীঠেই লুকিয়ে আছে?”

“কোন দুঃখে? তার কি আর মরার জায়গা নেই যে, আপনার ইঁদুরের গর্তে এসে ঢুকবে?”

“তবে যে বাপু তুমি আমার ঠেকে চড়াও হয়েছ?”

“যখন সংসারআশ্রমে ছিলাম, তখন জানা ছিল।”

“রাজাকে ধরে ফেললে কী হয়?”

“কিস্তিমাত!”

“এই তো বুঝেছেন। কিন্তু কিস্তিমাত হওয়ার আগেই যত জটিল আর কুটিল চাল দিয়ে রাজাকে আড়াল করতে হয়, ঠিক কিনা?”

“তা তো ঠিকই।”

“এটাও ধরুন, সেরকম খেলা চলছে। নানা জটিল আর কুটিল চাল। আমরা রাজা বাঁচানোর চেষ্টা করছি আর ওই লোকটা আমাদের রাজাকে তার আড়াল ভেঙে বের করতে চাইছে। কিছু বুঝলেন?”

“কিছু না বাবা।”

“যত কম বুঝবেন ততই মঙ্গল।”

“আর এই অন্ধকারটা ?”

“অন্ধকারের যা কাজ ছিল, তা হয়ে গিয়েছে। এবার অন্ধকার কেটে যাবে বাবাজি। সেই সঙ্গে আমিও।”

লোকটা কি চলে গেল? একটু গলাখাকারি দিয়ে আস্তে করে বললেন, “আছ নাকি হে?”

না, সাড়া নেই। অন্ধকারটাকেও হঠাৎ থিয়েটারের পরদার মতো কে যেন খ্যাঁচ করে টেনে সরিয়ে নিল। বটু চট করে হ্যারিকেন ধরিয়েও জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল, “জয় বাবাঠাকুরের জয়!”

কালী এসে বলল, “কারও সঙ্গে কি অন্ধকারে কথা কইছিলেন নাকি বাবাঠাকুর ?”

সনাতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ওরে বড় তৃষিত আত্মাই তো তাদের জ্বালাযন্ত্রণার কথা আমার কাছে বলতে আসে। আর যাবেই বা কার কাছে, বল?”

“আজ্ঞে, সে তো ঠিকই। আর সেই জন্যই বোধ হয় আজ অন্ধকারটাকে এত ঘন করে তুলেছিলেন বাবাঠাকুর। ওঃ, আপনার লীলা যত দেখছি, ততই আমার ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে মশাই।”

৭

দুপুরবেলায় মাটির বেহালা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রোগা, ছন্নছাড়া একজন ফেরিওয়ালা। বড় মাদক সুর, যেন সম্মোহন ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। ঝিমধরা দুপুরে যেন এক রূপকথার কুহক বয়ে আনল লোকটা। লোকে কাজ ফেলে শুনছে, আনমনা হয়ে যাচ্ছে। কোনও চেনা-চটুল গান নয়, সুরে যেন এক বহুদূরের ডাক। বেহালার সুর শুনতে পেল কালো একটা বিড়াল। জঙ্গলের গভীরে হঠাৎ সে তার ফসফরাস দু’টি চোখ মেলে তাকাল, যেন সে তার সংকেতধ্বনি শুনতে পেয়েছে। তার ডাক এসেছে। সে উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে যেতে হবে। সময় হয়েছে। কিন্তু তার সামনেই একটা বাধা। মস্ত একটা কেউটে সাপ ফণা তুলে পথ আটকে দাঁড়াল। দু'টি পুতির মতো চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জানতে চেষ্টা করছে, বন্ধু না শত্রু। সরু জিভ বারবার লেহন করছে বাতাসে। সঙ্গে ক্রুদ্ধ শ্বাস। বিড়ালটাও তার ফসফরাস চোখে স্থির হয়ে দেখল সাপটকে। তারপর সামনে এক পা বাড়াল। আমনি বিদ্যুতের মতো ছোবল মারল সাপটা। বাড়ানো পা-টা তুলে বিড়াল চতুর থাবায় হঠাৎ উলটে দিল সাপটকে। তারপর চিত হয়ে যাওয়া সাপটার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরে সাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আচমকা থাবাটা সরিয়ে নিয়ে সতর্ক চোখে চেয়ে রইল। ছাড়া পেয়ে সাপটা প্রাণভয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে হিলহিল করে পালিয়ে গেল। গাছের উপর থেকে একটা কাক হঠাৎ ডেকে উঠল, কা। বিড়ালটা একবার উপরের দিকে তাকাল। তারপর তার নরম, শব্দহীন পায়ে দ্রুত জঙ্গলটা পেরিয়ে গেল। একটা পুকুরধার ঘেঁষে দ্রুত পায়ে পুকুর ছাড়িয়ে লোকালয়ে ঢুকতেই তেড়ে এল একপাল নেড়ি কুকুর। ঘাউ-ঘাউ-ঘাউ। বিড়ালটা কুকুরদের দিকে হঠাৎ ফিরে তার তীব্র চোখে চেয়ে হঠাৎ শরীরটা ফুলিয়ে ফ্যাঁস করে একটা রাগের আওয়াজ করল। নেড়ি কুকুরেরা স্বভাবতই কাপুরুষ। কেউ রুখে দাঁড়ালে তারা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। আরও কয়েকবার ঘেউঘেউ করে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে ল্যাংল্যাং করে পাততাড়ি গোটাল। গাছের উপর থেকে কাকটা ডেকে উঠল, কা।

যেন কোথায় যেতে হবে, তা সে জানে এমনভাবেই বিড়ালটা জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভিতর ছুটতে লাগল। মাটির বেহালার সুরে ডাক এসে গিয়েছে। আর সময় নেই। রোদে ভরা একটা সবুজ মাঠ পেরচ্ছিল সে। নীচে ছায়া ফেলে মাথার উপর দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে উড়ে চলেছে কাকটাও।

আজ মাটির বেহালার শব্দে নাজেহাল হচ্ছেন গোলোকবাবু। কে যে বাজাচ্ছে, কে জানে! কিন্তু অঙ্ক কষতে-কষতে বারবার উতলা হয়ে যাচ্ছেন। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চিন্তার সূত্র। একবার ভাবলেন, বেহালাওয়ালাকে ডেকে কিছু পয়সা দিয়ে বাজনা বন্ধ করতে বলবেন, কিন্তু বাজনাটা বড় ভালও লাগছে তাঁর। বুকজড়ানো একটা সুর। অনেক পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে যেন!

কাজে মন দিতে পারছেন না গোলোকবাবু। অথচ হাতে তাঁর গুরুতর কাজ। সামনে সেই বিটকেল বইটার একটা পাতা খোলা। দুটো পাতাতেই একই অঙ্ক। অথচ দুটোর ফল আলাদা। অঙ্ক দুটো দু'ভাবে করা হয়েছে। দুটো পদ্ধতিই নির্ভুল। অথচ তিনি নিজে আলাদা ভাবে কষে দেখেছেন, ফল আলাদা হচ্ছে। এটা কীভাবে সম্ভব?

কে যেন বলে উঠল, "সম্ভব।"

কে বলল, তা খেয়াল করলেন না গোলোকবাবু। তিনি সর্বদাই একটা ঘোরের মধ্যে থাকেন। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে?"

"মুক্ত অঙ্কে সেটা সম্ভব।"

"মুক্ত অঙ্ক! সেটা আবার কী জিনিস?"

"মানুষ সীমাবদ্ধ মগজওয়ালা জীব। তাদের কাছে সংখ্যা একটা সীমাবদ্ধ ধারণা। কিন্তু সংখ্যা যখন তার সীমাকে অতিক্রম করে, তখন মানুষ তা ধারণা করতে পারে না।"

"কথাটা বোঝা যাচ্ছে না।"

"অসীমকে তুমি ধারণা করতে পার কি?"

"না, সেটা সম্ভব নয়।"

"ইনফিনিটির ভিতরেও অঙ্কের প্রবাহ বয়ে চলেছে। সেখানে সংখ্যাও মুক্ত, ভেরিয়েবল।"

"আরও নির্দিষ্ট করে বলুন।"

"একটা গাছে বারোটা গোলাপ ফুটে আছে। এই বারোটা গোলাপ একই অঙ্কের ফল, অথচ গুনে দ্যাখো, সব গোলাপের পাপড়ির সংখ্যা সমান নয়।"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"তোমার মগজ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম না করলে কী করেই বা বুঝবে ওই দুটো অঙ্কই নির্ভুল।"

"তবে আমি এতকাল ধরে যা শিখে এসেছি, সবই কি ভুল?"

"না, তবে সেগুলো আপেক্ষিক। স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার মধ্যে সেগুলোও ভুল নয়।"

"তা হলে আমি এই দুটো অঙ্কের কোনটাকে মানব?"

"ভাল করে লক্ষ করো। বর্ণ দিকের পাতাটা হল পজেটিভ। ডান দিকেরটা নেগেটিভ। তুমি ডান দিকের পদ্ধতিটা মনে রাখবে।"

"তা হলে কী হবে ?"

"ভাল হবে।"

"আমার মাথাটা আজ গুলিয়ে যাচ্ছে। ওই বেহালার শব্দই তার জন্য দায়ী।"

"না, তবে সুরটা খুব অদ্ভুত।"

"মাটির বেহালা তোমাকে কিছু বলতে চাইছে।"

"ভাল করে শোনো, বুঝতে পারবে।"

গোলোকবাবু বেহালাটা শুনতে লাগলেন। তাঁর চারদিকে সুরটা যেন একটা স্বপ্নলোক রচনা করে তুলছে। জেগে আছেন কিনা বুঝতে পারছেন না। গভীর রাতে গোলোকবিহারী হঠাৎ সচকিত হয়ে দ্যাখেন, তিনি তাঁর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। চারদিকে মলিন জ্যোৎস্নার আলো। আর রেলিংয়ে ভর দিয়ে পিছু ফিরে সেই পাদ্রির মতো পোশাকের সাহেব। সাহেব ধীরে-ধীরে তাঁর দিকে ফিরল। নীল জ্বলজ্বলে চোখ। "তোমার পরিশ্রম সফল। আমাদের সেন্সরে সেই ফেরারি অপরাধীর অবস্থানের সংকেত আসতে শুরু করেছে। আর দুটো ধাপ পেরতে পারলেই আমরা তাকে নাগালে পেয়ে যাব।"

গোলোকবাবু শুকনো গলায় বললেন, "আমিও চাই, সে ধরা পড়ুক। আমি আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।"

সাহেব তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "যন্ত্রণা? যন্ত্রণা কীরকম হতে পারে, তার কোনও ধারণাই নেই তোমার। তাকে যদি আমরা শেষ পর্যন্ত ধরতে না পারি, তা হলে কী হবে জান?"

"না।"

"আমরা বাতাসের প্রক্রিয়া জানি। বাতাসকে প্রথমে প্ররোচিত করা হবে, তারপর উত্তেজিত করা হবে আর তারপর উন্মাদ করে তোলা হবে। পাঁচশো মাইল বেগে বাতাস বইলে কী হয়, জান?"

"সাঙঘাতিক ঝড়!"

"বৃহস্পতি কিংবা শনি গ্রহে এরকম ঝড় হয়। কিন্তু আমরা যখন বাতাসকে উন্মাদ করে দেব, তখন এই কুড়ি মাইল বৃত্তের মধ্যে বাতাস ঘুরবে হাজার মাইল বেগে। বাতাসের সেই গর্ভগৃহে ঘুটন-যন্ত্রের মতো কেন্দ্রাভিগ টানে যত বাড়িঘর, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সব ভেঙে গুড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে। সমস্ত জায়গাটায় শুধু পড়ে থাকবে থকথকে কাদার মতো একটা জিনিস।"

আতঙ্কিত গোলকবাবু বললেন, "একজনকে মারার জন্য আপনারা সবাইকে মেরে ফেলবেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "না, শুধু ওই একজন কিন্তু মরবে না। ওই আসুরিক ঝড়েরও সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করার। সবকিছু ঘেঁটে কাথ হয়ে যাওয়ার পরও সে একা বেঁচে থাকবে। তখন তাকে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে যাবে। আমরা সেই পরিণতি চাইছি না। তোমাকে আজ যে অঙ্কটা দিয়ে যাচ্ছি, হয়তো বা সেটাই আমাদের শেষ অঙ্ক। ঠিক পদ্ধতিতে অঙ্কটা সমাধান হলে আমরা তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারব।"

"আমি কি পারব?"

"পারবে, পারতেই হবে। মনে রেখো এই যুদ্ধে অঙ্কই আমাদের একমাত্র অস্ত্র।"

৮

"তুমি কী যে সুন্দর বেহালা বাজাও বাবা! মাটির বেহালায় যে এত সুর আছে তাই তো জানতুম না! এত সুন্দর সুর তুমি কোথায় পেলে?"

"আমি পায়ে হাঁটা মানুষ মা। ঘুরে-ঘুরে বেড়াই। বাশবনে বাতাস বয়, নদীর জলে ঢেউ ভাঙে, পাখি ডাকে, মন্দিরে শাখ বাজে, আরতির ঘণ্টাধ্বনি হয়, মোয়াজ্জিনের আযান শোনা যায় এই সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমার সুর হয় মা।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"সে অনেক দূর অজান দেশ।"

"অত দূর থেকে মাটির বেহালা ফিরি করতে এসেছ! কটা পয়সাই বা হয় তোমার ?"

"পয়সা। না মা, পয়সা আর কোথায় হয়। তবে এই যে তোমার ভাল লাগল, এটাই আমার রোজগার।"

"কতটুকু খেলে তুমি? আর দু'টি ভাত নিয়ে আসি?"

"নামা, পেটপুরে খেয়েছি।"

ঘটি তুলে রোগা বুড়োটা অনেকটা জল খেল। ভেজা করুণ চোখে দৃশ্যটা দেখল মাধবী। ঘুরে-ঘুরে অনেকক্ষণ ধরে মাটির বেহালা বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে তাদের বাড়ির সুমুখেই হাছে ঠেস দিয়ে ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল লোকটা। বড় মায়া হয়েছিল মাধবীর। আহা রে, বোধ হয় খিদে পেটেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ডেকে দু'টি ভাত খাওয়ার কথা বলতে গিয়েছিল মাধবী। গিয়ে দেখে, কী আশ্চর্য দৃশ্য, ঘুমন্ত লোকটার গায়ে উড়ে-উড়ে বসছে কয়েকটা প্রজাপতি। মাথার উপরে গুনগুন শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছে মৌমাছি। কোলের উপর এসে ঝটাপটি করছে চড়ুইপাখি। ভাত খাওয়ার কথা বলতে একগাল হেসে রাজি। তারপর দাওয়ায় বসে কলাপাতায় বেড়ে দেওয়া ডালভাত আর একটু ব্যঞ্জন কত যত্ন করে খেল!

"আমাকে তোমার বাজনা শিখিয়ে দেবে বুড়ো বাবা?"

"বেহালা সুরে বাধা আছে মা, ছড়টায় একটু টান দাও।"

"আমি কি পারব?"

"টেনেই দ্যাখো।"

মাধবী খুব লজ্জায়-লজ্জায় মাটির বেহালাটা হাতে নিয়ে ধনুকের মতো কঞ্চির ছড়টা একটু টান দিল। ও মা! কী সুন্দর একটা সুরেলা শব্দ বেরিয়ে এল।

"বাঃ, বডড ভাল তো!"

"রেখে দাও মা, ইচ্ছে হলেই বাজাবে, আর যখন ঝড়টা উঠবে, তখন ছড় টেনে দেখো বেহালা থেকে শাখের আওয়াজ বেরিয়ে আসবে।"

"ও মা! তাই! কিন্তু ঝড় হবে কেন?"

"ঝড়-তুফান কি হয় না মা?"

"তা হয় বটে।"

"শঙ্খধ্বনি ভগবান শুনতে পান।"

"একটু বোসো বুড়োবাবা, বেহালাটার দাম এনে দিচ্ছি।"

বুড়োটা ঘাড় নাড়ল। কিন্তু পয়সা নিয়ে এসে মাধবী আর বুড়োটাকে কোথাও দেখতে পেল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল মাধবীর। বোধ হয় ভাত খেয়েছে বলেই লজ্জায় আর দামটা নিতে পারেনি।

অনেক উপর থেকে কাকটা তীক্ষ্ণ চোখে নীচের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল। রোদে ভরা সবুজ মাঠ, জঙ্গল, পুকুর, বাড়িঘর। অনেকটা উড়ে সে আবার চক্রাকারে ঘুরে বারবার গোটা জায়গাটার তল্লাশ নিচ্ছে। পোকামাকড়, ইঁদুর বা শস্যের দানা নয়। অন্য কিছু। সে ঘুরছে আর ঘুরছে। রোদের আলোয় কারও চোখে পড়ার

কথা নয়। কিন্তু সে দেখতে পেল দক্ষিণের দিক থেকে প্রায় অদৃশ্য সাদা নকশাগুলো ভেসে আসছে। চৌকোনো, ত্রিভুজ, চন্দ্রবিন্দু, ষড়ভুজ। একটা চাপা ক্রুদ্ধ "ক্কা' ডাক ছেড়ে সে তিরের মতো উড়ে গেল নকশাগুলোর দিকে। তারপর ডানার ঝাপটায় তীক্ষ্ণ ঠোঁটে, নখের আঁচড়ে ভেঙে টুকরো করে দিতে লাগল সব কিছু। ওলটপালট খেয়ে নানা বিভঙ্গে উড়তে-উড়তে সে ভেঙে লন্ডভন্ড করে দিতে-দিতে মাঝে-মাঝে উল্লাসে চিৎকার করে উঠছে, 'কা! কা!'

টেবিলের উপর সমাধিত অঙ্কটার দিকে ধ্যানস্থ চোখে চেয়ে বসেছিলেন গোলোকবাবু। অঙ্কটা কি ঠিক হল? তিনি বুঝতে পারছেন না। একটা অচেনা গলার স্বর কয়েকদিন আগে তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। কেন করেছিল তিনি জানেন না। শুধু জানেন, অঙ্কটা ভুল পদ্ধতিতে করলে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। তিনি তাই বারবার অঙ্কটার প্রতিটি ধাপ ফের অতিপাতি করে দেখলেন। মনে হল, তিনি ভুল করেননি। অঙ্কটা তার নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌছেছে। তিনি আর কী করতে পারেন? একজন অঙ্কবিদের সাধ্য আর কতটুকু। জাগতিক সব ঘটনার রাশ তো তার হাতে নেই! টেবিলের ওপাশে খোলা জানালা। তার পাল্লার উপর একটা কাক এসে বসেছে। ঘাড় নামিয়ে খুব তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে তাকে। চোখে চোখ পড়তে বলল, "কা! উলটো দিকের বাড়ির কার্নিসে সন্তর্পণে হাঁটছে একটা কালো মিশমিশে বিড়াল। ফসফরাসের মতো চোখে সে হঠাৎ তাকাল গোলোকবাবুর দিকে। বাইরের দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার একটা শব্দ পেলেন তিনি।

"কে?"

"বাবু, পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি আছে কি?"

"না হে বাপু।"

"ভাঙা বাসন, অচল ঘড়ি, বাতিল চশমা, পুরনো বই, খারাপ রেডিয়ো, ছেঁড়া জুতো কিছু নেই বাবু?"

"কিছুই নেই হে বাপু। বিরক্ত কোরো না। আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি।"

"খালি শিশি বোতল, জং ধরা সাইকেল, ভুল অঙ্ক, কিছু নেই বাবু?"

গোলোকবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "না হে বাপু, কিছু নেই। এবার দয়া করে কেটে পড়ো," বলেই গোলোকবাবু থমকালেন। শেষ কথাটা কী বলল লোকটা? ভুল অঙ্ক না! গোলোকবাবু এক ধাক্কায় চেয়ারটা ছিটকে ফেলে লাফিয়ে উঠলেন।

তারপর দৌড়ে গিযে দরজাটা দড়াম করে খুলে চেঁচিযে উঠলেন,"কে, কে হে তুমি বেয়াদপ?"

দরজার বাইরে যে লোকটা দাড়িয়ে আছে তার পরনে ময়লা ধুতি তাও আবার হাঁটু ছাড়ায়নি, গায়ে একটা কোঁচকানো জামা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, রুখু চুল। ভিজে বিড়ালের মতো নিরীহ চেহারা। তবে চোখ দুটোয় বোধ হয় ধূর্মামি রয়েছে।

গোলোকবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "এইমাত্র কী বললে যেন তুমি? ভুল অঙ্ক? আমি অঙ্কে ভুল করি? অ্যা!"

লোকটা আকাশ থেকে পড়ে বলল, “তাই কি বললুম নাকি কর্তা?”

“আলবাত বলেছ!”

লোকটা মাথা-টাথা চুলকে লজ্জায় মরে গিয়ে বলল, “ইস ছিছি, একটা ভুল কথাই বলে ফেলেছি বোধ হয়। মুখ্যু মানুষদের ওইটাই তো দোষ। কী কথা কইতে কী কয়ে ফেলে। কথাটা ধরবেন না কর্তা। এবারকার মতো মাপ করে দিন।”

"ওহে বাপু, ও সব চালাকি করে লাভ নেই। তুমি আমার কাজ ভন্ডুল করে দেওয়ার মতলবে এসেছ। এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। এই দিনতিনেক আগে কে যেন আড়াল থেকে ভুলভাল পরামর্শ দিয়ে মাথা গুলিয়ে দিচ্ছিল। এখন বুঝতে পারছি, সে তবে তুমিই।”

লোকটা হাঁ করে চেয়ে থেকে তারপর কপাত করে একদলা বাতাস গিলে ফেলে বলল, “আমি। কর্তা কইছেন কী? গুপ্তিপাড়ায় যে বাপের জন্মে আসিনি। আজই প্রথম।”

“শোনো বাপু, মিছেকথাগুলো আর বোলো না। আমার অঙ্ক যদি ভুলই হয়ে থাকে, তা হলে অঙ্কটা তুমি কষে দেখাও না!”

লোকটা ভারী কাচুমাচু হয়ে বলল,“আমি? কর্তা কি গেরিবের সঙ্গে মশকরা করতে লাগলেন? পেটে ডুবুরি নামালেও যে অঙ্কের অাঁশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের অঙ্কের বিদ্যে হাতের কর গুনতেই শেষ।”

“ওসব আমি শুনছি না। আমার কষা অঙ্ককে যখন ভুল বলেছ, তখন তোমার ছাড় নেই। এসো, অঙ্কে কোথায় ভুল আছে, বের করো দেখি খুঁজে।”

লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে টালুমালু করে চারদিকে চাইছিল। বোধ হয় পালানোর ফিকির। ঠিক এই সময় গোলোকবাবুর স্ত্রী ঘুমচোখে উঠে এসে বললেন, “ও পুরনো জিনিসওয়ালা, ভাঙা বাসন, শিশি-বোতল কিনবে?”

“কিনতেই আসা, মা।”

“তবে ভিতরের বারান্দায় এসো বাছা। অনেক জমে আছে।”

ব্যাপারটা গোলোকবাবুর মোটেই মনঃপূত হল না। কিন্তু একটু মৃদু গাইগুই করা ছাড়া আর কিছু করারও নেই তাঁর। স্ত্রীকে রীতিমতো সমঝে চলেন গোলোকবাবু। কারণ, তিনি ভুলো মনের মানুষ। স্ত্রীর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই তাঁকে চলতে হয়। তাই নিজে চেয়ারখানায় বসে একা-একা ফুঁসতে লাগলেন তিনি। অঙ্কটা বারকয়েক তুলে পরীক্ষা করলেন। কিছু ভুল হয়েছে বলে তার মনে হল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকটা ব্যাগবোঝাই করে বিস্তর বাসন আর শিশি-বোতল কিনে গোলোকবাবুর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভারী ভালমানুষের মতো ঘাড় নুইয়ে হাত জোড় করে একটা নমস্কার করে বলল,“আজ্ঞে, আজ তা হলে আসি কর্তা।”

গোলোকবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, “আসবে মানে? এলেই হল? খুব যে ভুল অঙ্ক বলে আওয়াজ দিলে! এবার করে দেখাও দেখি কোথায় ভুল! এই যে দ্যাখো, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে ভুল ধরো তো বাপু!”

গোলোকবাবু অঙ্ককষা কাগজখানা লোকটার নাকের ডগায় নাচিয়ে বললেন, "কই হে কোথায় ভুল? বাক্যি যে হরে গেল!"

লোকটা একগাল হেসে বলল, "এই হিজিবিজি অঙ্ক আমাদের কাছে সোজা করে ধরলেও যা, উলটো করে ধরলেও তা। তবে কিনা কর্তা, কত বড়-বড় মানুষেরও ছোটখাট ভুলভাল কত সময়ে হয়ে যায়। আমাদের সাপুইতলার হরপণ্ডিত একবার গদাধর লিখতে গাধাধর লিখে ফেলেছিলেন। ফটিকবাবুর কথাই ধরুন না কেন, ক্লাসে রোলকল করতে গিয়ে ফর্টি এইট, ফর্টি নাইনের পর কোন আক্কেলে ফর্টি টেন বলে বললেন বলুন তো কর্তা? রসময়বাবুর কথা শুনবেন? উনপঞ্চাশের সঙ্গে তেরো যোগ করতে গিয়ে তিনবার ভুল করলেন।"

গোলোকবাবু ধমকে উঠে বললেন, "তুমি কি বলতে চাইছ, এই অঙ্কটাতেও ভুল আছে?"

লোকটা খুব নিরীক্ষণ করে বলে, "না কর্তা, এ তো বেশ গোছানো জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। উপরদিকটা সরু মতো, তারপর দিব্যি চওড়া হয়ে আবার সরু হয়ে নেমেছে। না কর্তা, অঙ্কটা তো বেশ ভালই দেখাচ্ছে। কোথাও কাটাকুটিও নেই।" বলে লোকটা কাগজটা হাতে নিয়ে ভারী খুশি হয়ে বলে, "না, কাগজটা ভারী ভাল। মোলায়েম কাগজ।"

গোলোকবাবু ভ্রূকুটি করে লোকটিকে দেখছিলেন, "বাপু হে, অঙ্কের তুমি কিছু জানো?"

"তা আর জানি না! হাড়ে-হাড়ে জানি। অঙ্ক বেজায় কঠিন জিনিস।" গোলোকবাবু খপ করে লোকটির হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে বললেন,"তা হলে ভবিষ্যতে আর অঙ্ক নিয়ে ফুট কাটতে এসো না বুঝলে?"

লোকটা গদগদ হয়ে "যে আজ্ঞে," বলে জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে খুব ভক্তিভরে গোলোকবাবুকে নমস্কার করে চলে গেল। গোলোকবাবু ফের অঙ্কটা ভাল করে দেখতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর হঠাৎ মনে হল, অঙ্কটা কি একটু বদলে গিয়েছে কোথাও? যেভাবে কষেছিলেন, ঠিক সেরকম যেন মনে হচ্ছে না। কোথাও কি ক্যালকুলেশনে কোনও ধাপে একটা কিছু বাদ রয়ে যাচ্ছে? জটিল অঙ্কের ক্ষেত্রে ছোটখাটো বিচ্যুতি হয়ে যেতেই পারে। তিনি আবার অঙ্কটা নতুন একটা কাগজে কষতে বসে গেলেন। আর বাহ্যজ্ঞান রইল না।

রাঘববাবু ফুটবলের পোকা। নিজে একসময় বড় ক্লাবে খেলেছেন। আর পেলে-গ্যারিঞ্চ থেকে হালফিলের সব খেলুড়েদেরই খেলা দেখেছেন। কিন্তু গদাধর লিগের ফিরতি ম্যাচে বিদ্যাধরপুরের সঙ্গে গুপ্তিপাড়ার খেলা দেখতে বসে তিনি যা দেখেছিলেন, তা তাঁর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আর সেটা হল, গুপ্তিপাড়ার লিকলিকে রোগা পাঁচুর খেলা। ফুটবল খেলোয়াড়দের কয়েকটা জাত আছে। কারও খেলায় হিংস্র আগ্রাসন থাকে। কারও খেলায় থাকে চটুল শিল্পকর্ম, কারও খেলায় থাকে উজ্জ্বল উল্লাস। পাঁচুকে কোনওটাতেই ধরা যাচ্ছে না। ডান ও বাঁ, তার দুটো পায়েই বল বারবার এসে চুম্বকের টানে আটকে যাচ্ছে আর সে যেন

কখনও দুর্মর আলস্যে, কখনও ছুটির মেজাজে ইচ্ছেমতো ঘুরছে-ফিরছে। শুনেছিলেন, পাঁচু ভীষণ জোরে দৌড়য়। সেটা ঠিক। কিন্তু দাঁত-মুখ খিচিয়ে দমবন্ধ করে দৌড় নয়। ওর দৌড় ঢেউয়ের মতো। নর্তকের মতো। হরিণের মতো। ছেলেটার খেলা কি বিষাদে জড়ানো? ঠিক বুঝতে পারলেন না রাঘব। কিন্তু তাঁর কেমন যেন মনে হচ্ছিল, দু'টি পা অসম্ভব ভাল খেলছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোনও লক্ষ্যের অভিমুখ নেই। বারবার প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বিদ্যাধরপুরের গোলের মুখে পৌছে যাচ্ছিল সে। কিন্তু গোলে শট নিচ্ছে না। একে-ওকে-তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বল, আর তারা ধ্যাড়াচ্ছে। হাফ টাইমের আগেই অন্তত পাঁচ-ছটা গোল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেন গোলে মারতে বড়ই অনিচ্ছুক ছেলেটা। দলের খেলোয়াড়দের বলে দেওয়া ছিল মেরে খেলতে। পাঁচুকে মাঠের বাইরে না পাঠাতে পারলে বিদ্যাধরপুরের জেতার আশা নেই। ছেলেরা উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনেছে। কত বার পাঁচুকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া হল, তার হিসেব নেই। রোগা ছেলেটা প্রতিবার ল্যাং খেয়ে পড়ে যায়, তারপর উঠে একটু খোঁড়ায়। তারপর আবার ঠিক আগের মতোই তার ভূতুড়ে খেলা খেলে যেতে থাকে। ল্যাং খেয়ে উঠে কাউকে ল্যাং মারে না। ভাল কিছু দেখলেই রাঘববাবুর আবেগে চোখে জল আসে। আজও এল। তাঁর মনে হল, ছেলেটা ফুটবল খেলছে না। দুটো পায়ে যেন কবিতা লিখে যাচ্ছে। খেলা শেষের একটু আগে গুপ্তিপাড়া একটা গোল দিল দয়া করে। দশ গোল দিতে পারত। তাঁদের আগের অবস্থা থাকলে রাঘববাবু আজ পাঁচুকে সোনার মেডেল দিতেন। খেলা শেষে প্লেয়াররা যখন মাঠের বাইরে বেরিয়ে আসছে, তখনই গন্ডগোলটা লাগল। চার-পাঁচটা ছেলে দৌড়ে গিয়ে পাঁচুকে ঘিরে ফেলল। ধাক্কা দিতে-দিতে মাঠের অন্য প্রান্তে ঝিলটার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। বেধড়ক চড়-থাপ্পড় মেরেছিল তারা। এ কী অন্যায়। রাঘবের রক্ত গরম হয়ে গেল। একটা বজ্রগম্ভীর হকি ছাড়লেন, "খবরদার!" তারপর দৌড়ে গিয়ে ছেলেগুলোকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে পাঁচুকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

"এটা কী হচ্ছে?"

ছেলেগুলো রুখে উঠে বলল, "ও হিপনোটিজম জানে, রাঘববাবু ও আসার পর গুপ্তিপাড়ায় অনেক ভূতুড়ে ঘটনাও ঘটেছে। সকলে বলে, সনাতন সিদ্ধাই ওর মধ্যে ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

আর-একটা ছেলে বলল, "অত লিকলিকে রোগা হয়েও এই মস্ত একটা গাছের গুড়ি দুহাতে তুলে দশ ফুট দূরে নিয়ে ফেলেছিল। মানুষ হলে পারত?"

ভয়ে চুপসে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁচু। মুখচোখ সাদা, শরীর থরথর করে কাঁপছে।

রাঘববাবু বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, "আমি ওসব গালগল্পে বিশ্বাস করি না। আমি ফুটবল খেলাটা বুঝি। পাঁচু একজন ভীষণ ভাল প্লেয়ার। তোমাদের লজ্জা থাকলে ওর গায়ে হাত তুলো না, বরং পিঠ চাপড়ে দাও। গুণীকে সম্মান জানানোই মহৎ কাজ।"

ছেলেগুলো জানে, মরা হাতি লাখ টাকা। রাঘবের সেই প্রতাপ নেই বটে, কিন্তু তেজটা আছে। তাই তারা পিছু হটল। রাঘব পাঁচুর দিকে ফিরে বলল, "কিছু মনে কোরো না বাবা। তুমি বড্ড গুণী ছেলে। একদিন খুব নাম হবে তোমার।"

পাঁচু ম্লান একটু হাসল। রাঘববাবু লক্ষ করলেন, ছেলেটার চোখের মধ্যে প্রচণ্ড ভয় আর গভীর বিষাদ। কপালে হাত ঠেকিয়ে বোধ হয় কৃতজ্ঞতাই জানাল তাঁকে পাঁচু। তারপর দৌড়ে গিয়ে নিজের দলের সঙ্গে মিশে গেল।

সকালবেলাতেই দুলালখ্যাপা এসে হাজির। "বুঝলেন রাঘববাবু, কাল গণনা করে দেখেছিলাম, বিদ্যাধরপুর ম্যাচটা দশ গোলে হারবে। সকাল থেকেই যোগে বসে গিয়েছিলাম।"

"তাতে কী হল?"

"বাণ মেরে দশটা গোল আটকে তো দিয়েছি।"

"তারপরে কি বাণ ফুরিয়ে গিয়েছিল?"

"আজ্ঞে না। বাণটা মারতে যাব, এমন সময় একটা ডাঁশ এসে বগলে এমন কামড় বসাল যে, বাণ ফসকে গেল।"

৯

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য কিন্তু সন্ধানী অজস্র চোখ। তাকে স্পর্শ করার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে অদৃশ্য আঙুল। টের পাচ্ছে পাউচিই। রাত্রি নিশুত হওয়ার পর সে তার ঘর ছেড়ে ছাদে বেরিয়ে এল। উর্ধ্বমুখ হয়ে দেখল, আকাশ থেকে দিগন্ত, সর্বত্র ফুটে উঠেছে আলোর অজস্র নকশা। গোল, চৌকো, ত্রিভুজ, চাঁদের ফালির মতো। ওইসব চিহ্নকে সে গভীর ভাবে চেনে। এক জটিল অঙ্ক আস্তে-আস্তে তার অমোঘ সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে তার আড়াল। তার সংখ্যা ও সংকেত, তার প্রতীক ও পরিচয়ের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে লয়কারী অস্তিত্বের সংকট। সে, পাউচিই, আর কিছুই করতে পারে না। অপেক্ষা করা ছাড়া। গুপ্তিপাড়া থেকে বিদ্যাধরপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ লোকালয়ের বহু মানুষই এই অদ্ভুত দৃশ্যটা রাত জেগে দেখছে। সকলেই উধর্বমুখ, শঙ্কিত, বিস্মিত। তারা এর মানে বুঝতে পারছে না। কী হবে, তাও জানে না। এটা কোনও লেজার শো কিনা, তাও ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। যদি হয়ও, তা হলেও আকাশ জুড়ে তা হওয়ার কথা নয়। গোলোকবাবু তাঁর বাড়ির ছাদে দাড়িয়ে রয়েছেন। শরীরের ভিতরে এক ভয়ের কাঁপুনি, উদ্বেগ। গলা শুকিয়ে কাঠ। অতিকায় সাহেব তাঁর আঙুল দিয়ে শূন্যে গোলোকবাবুর অঙ্কটা লিখে চলেছে। শূন্যে সাদা অক্ষরে ফুটে উঠছে অঙ্ক। গোলোকবাবু হাঁ করে দেখছেন। এ কি কোনও জাদুকরের খেলা ? এ কি ভৌতিক কিছু?

সাহেব আপনমনে তার ভাষায় কী যেন বলছে। গোলোকবাবু বুঝতে পারছেন। সাহেব বলছে, “কোথায় পালিয়ে থাকবে তুমি? অনেক ছুটিয়ে মেরেছ আমাদের। হয়রান করেছ। বিভ্রান্ত করেছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান নও। মেধার লড়াইয়ে তোমাকে হার মানতেই হবে, পাউচিই। সেন্সর তোমার স্পন্দন টের পাচ্ছে। তোমার গন্ধ পাচ্ছে। তোমার বিকিরণ ধরা পড়ছে। অতিমানব, এবার নত হও। হার স্বীকার করো এবং মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নাও।”

অঙ্কটা ভেসে রইল শূন্যে। তারপর আচমকা অদৃশ্য হয়ে সেই জায়গায় একটা আলোর চৌখুপি দেখা দিল। যেন শূন্যে এটা মস্ত জানালা খুলে দিল কেউ। গোলোকবাবু বিস্ময়ে হা হয়ে দেখতে লাগলেন, সেই চৌখুপির ভিতর দিয়ে যেন দিনের আলোয় চরাচরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। জানালা যেন মাঠঘাট পার হয়ে ট্রেনের মতো দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছে কোথায়। মুহুর্মুহু দৃশ্যপট পালটে যাচ্ছে। তারপর তার গতিবেগ ধীর হয়ে এল। হঠাৎ জানালায় তারাভরা আকাশের ছবি ফুটে উঠল।

সাহেব ভ্রুক কুঁচকে কাঁর দিকে চেয়ে বলল,“ভুল অঙ্ক!”

গোলোকবাবু চমকে উঠে বললেন, “ভুল! ভুল হবে কেন?”

সাহেব ধৈর্যহীন রাগে গর্জন করে ওঠে, “ভুল, ভুল, ভুল! সমাধান বদলে গিয়েছে। তুমি মূর্খ! বোকা! দায়িত্বজ্ঞানহীন।”

অপমানটা বড় অাঁতে লাগল গোলোকবাবুর। আর তাইতেই ভয়-ভয় ভাবটাও কেটে গেল। কান দুটো গরম। গোলোকবাবু বেশ ফুঁসে উঠেই বললেন, “আমি অঙ্ক সামান্যই জানি। কিন্তু যেটুকু জানি, তাতে ভুল করি না মশাই!”

সাহেব তাঁর দিকে ক্রুর চোখে চেয়ে বলল, “তুমি একজন শঠ, খল এবং মিথ্যেবাদী। তুমি আমাদের বিভ্রান্ত করেছ। ভুল পথে চালনা করেছ। একদম শেষ ধাপে এসে আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল। অথচ আমরা পাউচিইর খুব কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলাম। তার শ্বাসপ্রশ্বাসও শোনা যাচ্ছিল। মাত্র এক পরদা দূরে ছিল সেই অতিমানব। একটুর জন্য...”

‘পাউচিই কে?”

“জেনে কী করবে? জেনেও তোমার লাভ নেই। যে সীমাহীন মেধা তার মগজে রয়েছে, তার ছিটেফোঁটাও ধারণ করার সাধ্য তোমার নেই। পাউচিই এক সম্রাট। মেধার রাজ্যের সম্রাট। আমরা তাকে স্থানচ্যুত করতে চাই, বুঝেছ?”

“আপনারা কারা?”

“আমরা? আমরাও মেধার কারবারি। আমাদের স্পন্দন আলাদা। আমাদের সংকেত আলাদা। পরিচয় আলাদা, তুমি কিছুই বুঝবে না।”

“আপনারা কোথাকার লোক?”

“আমাদের বিচরণক্ষেত্র বহু দূর ছড়ানো। সে এক অচিনপুর। তোমাদের মতো গ্রহবাসী নই আমরা।”

"আপনি এখন কী করতে চান?"

সাহেব ভ্রুকুটি করে বলে, "আমি খুব হতাশ। আমি বিরক্ত। আমি অবসাদ বোধ করছি। পাউচিইকে সম্পূর্ণ লয় করে দেওয়ার এমন এক সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না। তোমাদের এই সুন্দর আর নিরীহ জনপদটি ধ্বংস করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমাদের। কিন্তু তুমি আমাদের সাহায্য করলে না। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। ভুল অঙ্ক কষে আড়াল করেছ পাউচিইকে। তার ফল তোমাদের এই জনপদকেই ভোগ করতে হবে।"

গোলোকবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "কী হবে সাহেব?"

"বাতাস প্ররোচিত হবে, তারপর উত্তেজিত, তারপর উন্মাদ বাতাস বইবে হাজার মাইল গতিতে। তার ঘূর্ণাবেগে এই গর্ভগৃহে সব কিছুই বিলুপ্ত হওয়ার পর পাউচিই একা দাঁড়িয়ে থাকবে। এই পরিণতি দরকার ছিল না, যদি তুমি অঙ্কটায় ভুল না করতে।"

"আমি ভুল করিনি।"

"করেছ, এবং ইচ্ছে করেই করেছ।"

"না সাহেব, আমি শুধু তোমার হুকুম পালন করেছি। বিশ্বাস করো, আমি পাউচিইকে আড়াল করার চেষ্টা করিনি। আমাকে একটা বন্দুক লও, আমি নিজে পাউচিইকে খুন করব, যাতে আমাদের গ্রাম দুটো বাঁচে।"

"তুমি পাউচিইকে খুন করবে? তাও বন্দুক দিয়ে?"

"করব। সে তো আর অমর নয়।"

সাহেব ভ্রু কুঁচকে তাঁর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, "না, সে অমর নয়। আমরা কেউই নই। তবে বেঁচে থাকার নানা মাত্রা আছে। স্তরবিন্যাস আছে। বন্দুক আমাদের অস্ত্র নয়। দ্বিতীয় কথা, পাউচিই যে কে, তা তুমি বুঝবে কী করে? তার পরিচয় যে জটিল সংকেতের মধ্যে ডুবে আছে, তুমি তা ভেদ করতে পারনি।"

"বাতাস সংবরণ করো সাহেব। আমি তাকে খুঁজে বের করবই। শুধু একটা বন্দুক দাও আমাকে।"

"নির্বোধ ! হীন মেধার মানুষই পশুশক্তির উপর নির্ভর করে। গায়ের জার বা আগ্নেয়াস্ত্র কোনও শক্তিই নয়। ক্ষুরধার মেধার কাছে তারা শিশুর খেলনা মাত্র।"

"আমরা মরতে চাই না সাহেব।"

"কেউই চায় না। নিজের মৃত্যুকে তুমিই অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছ। কৃতকর্মের ফল নতমস্তকে গ্রহণ করাই নিয়ম।"

সাহেব আস্তে-আস্তে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে দেখে আতঙ্কে গোলোকবাবু আর থাকতে না পেরে লাফিয়ে গিয়ে সাহেবের হাত চেপে ধরলেন। কিন্তু তার হাত খানিকটা শূন্যকে খামচে ফিরে এল। "সাহেব, সাহেব," বলে চিৎকার করতে লালেন গোলোকবাবু। আর ঠিক এই সময়েই তিনি বাতাসের মধ্যে একটা ফিসফাস শুনতে পেলেন। খুব মৃদু চাপা স্বরের মতো। শিস দেওয়ার মতো কী যেন

ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। এটাই কি প্ররোচনা? কেউ কি বাতাসের কানে-কানে কিছু বলছে? মন্ত্র? নাকি অঙ্ক? বাতাসে শিস দেওয়ার শব্দটা ধীরে-ধীরে চৌদুনে উঠছে। তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তার সামনে শূন্যে দ্রুত ফুটে উঠছে দুর্বোধ্য সব অঙ্কের সংকেত চিহ্ন। গোলোকবাবু হাত বাড়িয়ে অঙ্কগুলোকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন পাগলের মতো। কিন্তু কিছুই হল না। অঙ্কগুলো আস্তে-আস্তে শূন্যে উঠে যেতে লাগল। বাতাসে প্রথম ঢেউটা এল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। একটা ঢেউ কেটে গেলে আর-একটা তীব্রতর ঢেউ গোলোকবাবুকে ঠেলে ফেলে দিল শানের উপর। গোলোকবিহারী কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ালেন এবং শুনতে পেলেন হাজারটা জেট প্লেন হঠাৎ ওই দুরের ঝিল পেরিয়ে যে জঙ্গল, সেখান থেকে গর্জন করে উঠল। সেই শব্দেই যেন ক্ষিপ্ত বাতাস আ-আ-আ করে এক অবিশ্বাস্য আর্তনাদে ধুলোটে খ্যাপা মারমুখো পাগলের মতো দিগন্ত ঢেকে ফেলল ধুলোর পরদায়। গোলোকবাবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখলেন, যা তিনি দেখবেন বলে কখনও কল্পনাও করেননি। একটা ঝড় জঙ্গলের সব গাছ উপড়ে ঝিলের জলে জলস্তম্ভ তৈরি করে মারমার করে ছুটে আসছে। এক মহামন্থনে সব কিছু মিশিয়ে দেবে। শঙ্খ বাজল নাকি? সেই সঙ্গে এই সর্বনাশা সময় কে মাটির বেহালা বাজিয়ে যাচ্ছে। আর কালিমাখা কালো অন্ধকার কোথা থেকে উঠে এসে মুছে দিচ্ছে শূন্যের অঙ্কগুলোকে। বাতাসে কালান্তক ঢেউ উঠছিল, গোলোকবাবু তাতে বারবার ঝাপটা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। এ কি তাঁর অপরাধ? এইসব একমাত্র তাঁর অপরাধে তা হলে মৃত্যুই তাঁর পক্ষে শ্রেয়।

মাটির বেহালাটা এই অসময়ে কোন পাগল বাজিয়ে চলেছে? এ সময়ে কেউ বেহালা বাজায়? শাঁখই বা বাজায় কে? আর ওই আলকাতরার মতো অন্ধকারই বা কোথা থেকে উঠে আসছে?

খানিক ওলটপালট খেয়ে গোলোকবিহারী একসময়ে উঠে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য! ওই কালান্তক ঝড়টা এখনও বিল পেরিয়ে বিশাল জলস্তম্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গজরাচ্ছে। কিন্তু এগোচ্ছে না। একটা জায়গাতেই থমকে গিয়েছে। যেন কেউ 'তিষ্ঠ' বলে ঝড়কে সামলে রেখেছে। গোলোকবিহারী আতঙ্কিত চোখে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। আস্তেআস্তে ঝড়টার রোষ কমে যাচ্ছে। ঝিমিয়ে পড়ছে। জলস্তম্ভ ভেঙে ঝিলের জল ফের ঝিলে ফিরে যেতে লাগল। জেট প্লেনের শব্দ ধীরেধীরে নেমে মিলিয়ে গেল। পিছন থেকে কে যেন বলল, "অঙ্কটা ভুল করেছিলেন বটে কর্তা। কিন্তু কাজটা ভুল করেননি।"

"কে?"

গোলোকবাবু অবাক হয়ে ফিরে দেখেন, ছাদের আধা অন্ধকারে ঝোলা কাঁধে একটা লোক দাঁড়িয়ে।

"কে হে তুমি?"

"সেই যে পুরনো জিনিসপত্র কিনতে এসেছিলুম!"

"ওঃ ! কী বললে? আমার অঙ্কে ভুল হয়েছিল? তুমি অঙ্কের কী জানো হে ?"

"অঙ্কের জানি লবডঙ্কা। আমাদের কাছে অঙ্কের চেয়ে একটা কাঁচালঙ্কার কদর অনেক বেশি। পান্তাভাত চটকে খেতে যেন অমৃত।"

চিন্তিতমুখে গোলোকবাবু বললেন, "অঙ্কটা মোটেই ভুল হয়নি। সাহেব আবার এলে বুঝিয়ে দেব।"

"সাহেব আর আসবে না কর্তা।"

"আসবে না? কী করে জানলে?"

"সাহেব হেরে গিয়েছে। আর হেরে গেলে ওরা নেই হয়ে যায়। আপনার বড্ড ধকল গিয়েছে কর্তা। রাতও আর বেশি নেই। গিয়ে একটু গড়িয়ে নিন।"

গোলোকবাবু বড়ই আলাভোলা মানুষ। ছাদের উপর মাঝরাতে একটা উটকো লোক কী করে এল, এ প্রশ্নটা তাঁর মাথাতেই এল না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই যাচ্ছি।"

নিশুত রাত যখন ভোরের দিকে একটু ঢলে পড়েছে, তখন গুপ্তিপাড়া ছেড়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল তিনজন মানুষ।

সামনের জন রোগামতো বুড়োমানুষ। তার কাঁধে ঝোলা। পরের জন মাঝবয়সি। তার এককাঁধে মিশমিশে কালো বিড়াল। অন্য কাঁধে একটা কাক। শেষের জন পাঁচু। কারও মুখে কোনও কথা নেই। নীরবে তারা খানিকদূর হাঁটল। তারপর ডানদিকের একটা মেটে রাস্তা ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে।

সামনের জন এক জায়গায় থমকে নেমে গিয়ে শুধু বলল, "এখানে।"

সামনে বাতাসের মধ্যেই যেন একটা অদৃশ্য দরজা খুলে গেল তাদের জন্য। একে-একে তারা সেই অদৃশ্য দরজার ভিতরে মিলিয়ে গেল।